বয়ঃসন্ধিকালের

যৌন শিক্ষা

(১০ থেকে ১৯ বছর বয়সের কিশোর-কিশোরীদের জন্য)

ডাঃ মোঃ ফাইজুল হক

আয়ুর্বেদিক নিকেতন
এ-৩৮/১, ইসলামপুর, [সরকারি হাসপাতাল ও খাদ্য গোডাউন মোড়ের মাঝে
আমবাগান জামে মসজিদের গলি (চার তলা মসজিদ)],ধামরাই, ঢাকা, বাংলাদেশ।
মোবাইলঃ ০১৯৭২ ৮৫৯৯৫০, ০১৭১২ ৮৫৯৯৫০

প্রকাশক ঃ
আয়ুর্বেদিক নিকেতন
এ-৩৮/১, ইসলামপুর, [সরকারি হাসপাতাল ও খাদ্য গোডাউন মোড়ের মাঝে আমবাগান জামে মসজিদের গলী (চার তলা মসজিদ)],ধামরাই, ঢাকা, বাংলাদেশ।
মোবাইলঃ ০১৯৭২ ৮৫৯৯৫০, ০১৭১২ ৮৫৯৯৫০

প্রথম প্রকাশঃ নভেম্বর - ২০২২

প্রচ্ছদঃ আয়ুর্বেদিক নিকেতন

মুদ্রনঃ আয়ুর্বেদিক নিকেতন

মূল্যঃ ৮০ টাকা

উৎসর্গ

বড় ছেলে তাকি উসমান,
মেজো ছেলে তালহা তহা
তাদের এখন বয়ঃসন্ধিকাল!

আমার কিশোর ছেলেসহ
সকল কিশোর-কিশোরীদের জন্য এই বই।

সূচিপত্র

❖ ভূমিকা ০৭
❖ বয়ঃসন্ধিকাল ও কৈশোর ১০
❖ বয়ঃসন্ধিকালের শারীরিক পরিবর্তন ১০
❖ বয়ঃসন্ধিকালের মানসিক পরিবর্তন ১১
❖ কৈশোরের ঝুঁকি ১২
❖ ঝুঁকি প্রতিকারে করণীয় ১২
❖ জেন্ডার (Gender) ধারণা ১৩
❖ ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ ১৩
❖ বৈষম্যমূলক আচরণ দূর করতে করণীয় ১৫
❖ কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ১৬
❖ প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনীয়তা ১৬
❖ প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে করণীয় ১৭
❖ প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষায় করণীয় ১৭
❖ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ১৭
❖ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য করণীয় ১৮
❖ নিরাপদ যৌন আচরণ ১৮
❖ নিরাপদ যৌন আচরণের জন্য করণীয় ১৯
❖ যৌন নিপীড়ন ২০
❖ প্রজননতন্ত্র ২০
❖ ছেলেদের প্রজননতন্ত্র ২১
❖ মেয়েদের প্রজননতন্ত্র ২২
❖ মেয়েদের মাসিক বা ঋতুস্রাব ২৩
❖ প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনরোগ ২৪
❖ গনোরিয়া ২৫
❖ ক্লামাইডিয়া ২৬
❖ ট্রাইকোমনিয়াসিস্ ২৬
❖ সিফিলিস ২৬
❖ ক্যানডিডিয়াসিস ২৭

❖ হারপিস্ জেনিটালিয়া ২৭
❖ শ্যাংক্রয়েড ২৭
❖ প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনরোগ হলে করণীয় ২৭
❖ এইচআইভি ও এইডস কি? ২৮
❖ এইচআইভি কিভাবে ছড়ায় ২৮
❖ এইচআইভি কিভাবে ছড়ায় না...২৮
❖ এইচআইভি-তে আক্রান্ত ব্যক্তির লক্ষণসমূহ ২৯
❖ এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধে করণীয় ৩০
❖ এই বয়সের ছেলে-মেয়েদের মনের যত প্রশ্ন.............................৩১
❖ প্রশ্ন : ভালো স্বাস্থ্য ধরে রাখতে হলে আমাদের কি কি করণীয়?.......৩১
❖ প্রশ্ন : আমার অসুস্থ এবং দুর্বল লাগে কি করবো?.......................৩১
❖ প্রশ্ন : ব্রন হচ্ছে কি করবো? ৩১
❖ প্রশ্ন : যোনিপথে স্রাব নির্গত হয় কেন? এ ধরনের রোগ হলে আমি কি করব? ৩২
❖ প্রশ্ন : আমার বন্ধু অপু এবং আমি একই বয়সের, তারপরও সে দেখতে কেন ছোট? ১৩/১৪ বছরের ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে মেয়েদের কেন বড় দেখা যায়? ৩২
❖ প্রশ্নঃ আমার নাম সুমি, তাহলে আমি কি বড় হয়ে গেছি? ৩৩
❖ প্রশ্নঃ কখনো দেখা যায় অল্পবয়সী মেয়েদের অনেক বড় স্তন। এটা কিভাবে হয়? ৩৩
❖ প্রশ্নঃ কেন ১৩/১৪ বছরের একটি মেয়েকে ওড়না, পায়জামা ও ব্রা পরতে হয়? ৩৩
❖ প্রশ্নঃ মেয়েদের কেন মাসিক হয়, ছেলেদের কেন হয় না? ৩৩
❖ প্রশ্নঃ মাসিক কেন হয়? ৩৩
❖ প্রশ্নঃ যখন আমার প্রথম মাসিক শুরু হলো তখন আমি ভাবলাম এ আমার কি হলো? ৩৪
❖ প্রশ্নঃ এই মাসিকের রক্তপড়া কি বন্ধ হবে না? এটা আবার কি ঝামেলা? ৩৪
❖ প্রশ্নঃ মাসিকের সময় কিভাবে চলতে হয়?...............................৩৪
❖ প্রশ্নঃ কেউ মাসিকের রক্ত দেখে ফেললে তা কি

লজ্জার ব্যাপার নয়? ৩৫
❖ প্রশ্নঃ মাসিকের সময় তলপেটে ব্যথা হলে কি করা উচিত? ৩৫
❖ প্রশ্নঃ আমি শুনেছি মাসিকের সময় মাছ খাওয়া উচিত নয়, কারণ এতে রক্তে দুর্গন্ধ হয়। আমি খেয়ে দেখেছি। আসলেই কি মাছ খেলে এমন হয়? ৩৫
❖ প্রশ্নঃ মেয়েরা ১৩/১৪ বছর বয়সে বড় হয়, ছেলেরাও কি বড় হয়?...৩৬
❖ প্রশ্নঃ অনেকের স্বপ্নদোষ হয়। কেন হয়? (স্বপ্নদোষ কেন হয়?) ৩৬
❖ প্রশ্নঃ অনেকে বলে স্বপ্নদোষ হলে শরীরের সব শক্তি বের হয়ে যায়। এটা শরীরের ভিতর ধরে রাখার কোনো উপায় আছে কি? ৩৬
❖ প্রশ্নঃ স্বপ্নদোষ হলে কি করতে হয়? ৩৭
❖ প্রশ্নঃ অত্যধিক পরিশ্রম করলে কি স্বপ্নদোষ হয়? ৩৭
❖ প্রশ্নঃ শুনেছি ছেলেদের রক্ত থেকে বীর্য তৈরি হয়। কথাটা কি ঠিক? (ছেলেদের রক্ত হতে কি বীর্য তৈরি হয়?) ৩৭
❖ প্রশ্নঃ আমার লিঙ্গ খাড়া হয়ে যায় কেনো? ৩৭
❖ প্রশ্নঃ যখন ছেলেমেয়ে বড় হওয়া শুরু করে তখন মা-বাবা বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে কিভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করা যায়? ৩৭
❖ প্রশ্নঃ বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক পরিবর্তন মোকাবেলায় আমাদের কি করা উচিত? ৩৮
❖ প্রশ্নঃ মা-বাবা কোথাও যেতে নিষেধ করলে খুব রাগ হয়, কেন বুঝতে চায় না তারা? ৩৯
❖ প্রশ্নঃ আগে রাস্তাঘাটে খেলা করতাম, এখন কেন পারি না? ৩৯
❖ প্রশ্নঃ উত্যক্ত করা কি স্বাভাবিক ব্যাপার? এটা কি আসলেই মজা করা? ৪০
❖ প্রশ্নঃ কিভাবে আমরা যৌন নিপীড়ন থেকে নিজেকে রক্ষা করব? ...৪০
❖ প্রশ্নঃ আমার এক বান্ধবীর গায়ে তার এক শিক্ষিত আত্মীয় হাত দিয়েছিল। শিক্ষিত হয়েও সে একাজ কেন করলো? ৪১
❖ প্রশ্নঃ যৌন নিপীড়নের মুখোমুখি হলে কি করবো? ৪১
❖ প্রশ্নঃ পরিবার পরিকল্পনা কি? ৪২
❖ প্রশ্নঃ জন্মনিয়ন্ত্রণ কি? ৪২
❖ গুড টাচ (ভালো আদর), ব্যাড টাচ (খারাপ আদর)

বিষয়ক প্রশ্ন উত্তর ৪৩
❖ প্রশ্নঃ আমাদের বডি পার্টস বা শরীরের অংগগুলো কয় ধরনের? ৪৩
❖ প্রশ্নঃ প্রাইভেট পার্টস কেনো বলে এগুলোকে? ৪৩
❖ প্রশ্নঃ কোনগুলো তোমার শরীরের প্রাইভেট পার্টস? ৪৩
❖ প্রশ্নঃ ভালো আদর (গুড টাচ) কোনগুলো? ৪৩
❖ প্রশ্নঃ খারাপ আদর (ব্যাড টাচ) কোনগুলো? ৪৩
❖ প্রশ্নঃ কেউ যদি প্রাইভেট পার্টস এ হাত দেয় বা আদর করতে চায় বা খেলতে চায় এটাকে কি বলে? ৪৩
❖ প্রশ্নঃ কে কে করতে পারে যৌন হয়রানি? ৪৩
❖ প্রশ্নঃ যৌন হয়রানি কোথায় হতে পারে? ৪৪
❖ প্রশ্নঃ এবিউসাররা (দুষ্টু লোকেরা) সাধারণত কি বলে থাকে বাচ্চাদের ভয় দেখানোর জন্য, এগুলো কি সত্য? ৪৪
❖ প্রশ্নঃ কি হবে যদি দুষ্টু লোকেরা তোমাকে খারাপ আদর করে বা যৌন হয়রানি (সেক্সুয়ালি এবিউস) করে আর তুমি কাউকে না বলো? ৪৪
❖ তোমাদের জন্য কিছু পরামর্শ ৪৫

ভূমিকা

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ কিশোর কিশোরী। এই কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষা, জীবন দক্ষতা ও স্বাস্থ্যের ওপর নির্ভর করছে দেশের সার্বিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

শৈশব ও যৌবন এ দুয়ের মাঝে কৈশোরকাল একটি সেতুর মতো কাজ করে। কিছুদিন আগেও যে শিশুটি মা-বাবা ও পরিবারের ছোট্ট গন্ডির মধ্যে বেড়ে উঠছিল - ধীরে ধীরে সে বাইরের পরিবেশে মিশতে শুরু করে। একই সময়ে তার শরীর এবং মনেও আসে নানা ধরণের পরিবর্তন। সবকিছু মিলিয়ে জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় অতিক্রম করে সে। কৈশোরের শিক্ষা, জ্ঞান ও অভ্যাস তার পরবর্তী জীবনের উপর অনেক প্রভাব ফেলে। কাজেই বর্তমান ও ভবিষ্যতকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে কিশোর-কিশোরীদের যেমন সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন তেমনিভাবে মা-বাবা, পরিবার তথা সমাজের সবাইকে তাদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য এখনই এগিয়ে আসা জরুরি।

কৈশোরে ছেলে-মেয়েরা প্রজনন ক্ষমতা অর্জন করে। এ সময় বিভিন্ন ধরণের স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি তাদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। অনেক সময় তারা লজ্জা, সংকোচ বা ভয়ে এসব বিষয়ে কারো সাথে কথা বলে না- ফলে নানা ধরণের শারীরিক জটিলতা দেখা দেয়। এসব জটিলতা এড়ানোর জন্য প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাদের সঠিক তথ্য জানা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে আমাদের এই বই।

আমাদের দেশে যৌন শিক্ষা এখনও সমাদৃত নয়। সামাজিকভাবে বিষয়টি নিয়ে ভাবনার প্রতিও তাই রয়ে গেছে একটা বড় রকমের বাঁধা।

সুদূর আফ্রিকাতে যৌন শিক্ষা শুরু হবার সবচেয়ে বড় কারণ হল এইডস এর প্রকোপ। ইজিপ্টে পাবলিক স্কুলগুলোতে মেয়েদের reproduction system, sexual organs, contraception এবং STD (sexual transmitted disease) নিয়ে পড়ানো হয়। এই সকল ছেলেমেয়েদের বয়স ১২ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। থাইল্যান্ডে এই অবস্থা আরও একটু ভালো। প্রতিবারের কারিক্যুলাম রিভিশনের সাথে সাথে যৌন শিক্ষার বিষয়গুলো রিভিশন করা হয়। ১৯৩৮ সালে সর্বপ্রথম সেক্সুয়ালিটি এডুকেশন নিয়ে স্কুলসমূহে পরিচিতি করানো হয়, কিন্তু ১৯৭৮ সালের আগে স্কুলে যৌনশিক্ষা সম্পর্কে পাঠদান দেওয়া হয়নি। তখনকার দিনে একে বলা হতো

"জীবন ও গার্হস্থ্য শিক্ষা"। এর বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য-সুরক্ষা, পরিচ্ছন্নত এবং প্রজননতন্ত্র সম্পর্কে প্রাথমিক ধারনা। তবে সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগে শিক্ষা কারিকুলাম কয়েকবার রিভাইস করা হয়েছে এবং বয়ঃসন্ধিকালে যৌনশিক্ষার প্রচলন সমস্যার সমাধান করবে বলে আশা করা হয়। ভারতে স্কুলশিক্ষায় এবং গণসচেতনতা বিষয়ক কার্যক্রমে এইডস সহ যৌনশিক্ষা বিষয়ক নানা বিষয় সম্পর্কে টেক্সট অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইন্দোনেশিয়া, মঙ্গোলিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ায় স্কুলসমূহে যৌনশিক্ষা বিষয়ে পাঠ-অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত আলোচনা তাদের নিয়মিত নীতি-পর্যালোচনার অন্তর্ভুক্ত বিষয়। মালয়শিয়া ও থাইল্যান্ডে বয়ঃসন্ধির সময়ে দরকারি প্রজননস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে এই সংক্রান্ত বিষয়বস্তু নিয়ে প্রশিক্ষণ, মোবাইল মেসেজ ও অন্যান্য মেটেরিয়াল তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশ, মায়ানমার, নেপাল ও পাকিস্তানে যৌনশিক্ষা সংক্রান্ত কোনো সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম নেই। জাপানে ১০/১১ বছর বয়স থেকে যৌনশিক্ষা আবশ্যক করা হয়েছে। চীন ও শ্রীলংকায় যৌনশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হলো জীববিজ্ঞান গ্রন্থের প্রজননতন্ত্র সংক্রান্ত অধ্যায়গুলি পাঠ্যসূচিতে রাখা। শ্রীলংকায় এই পাঠ দেওয়া হয় যখন শিক্ষার্থীদের বয়স ১৭/১৮ বছর হয়। ফিনল্যান্ডে ছোট ক্লাসে বায়োলজির মানব শরীর সংক্রান্ত পাঠদান আবশ্যক করা হইয়েছে এবং উপরের দিকের ক্লাসে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ধারণা দেওয়া হয়। ফ্রান্সে স্কুলগুলোতে যৌনশিক্ষা দেওয়া শুরু হয়েছে ১৯৭৩ সাল থেকে। সেখানে ৩০ থেকে ৪০ ঘন্টা যৌনশিক্ষা দেওয়া হয়। জার্মানিতে এই শিক্ষাদান শুরু হয়েছে ১৯৭০ সাল থেকে এবং ১৯৯২ সাল থেকে এটা একটা সরকারী দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানে বয়স বাড়ার সাথে সাথে শরীরের বৃদ্ধি কীভাবে হয়, প্রজননের জৈবনিক কর্মকাণ্ড, যৌন ক্রিয়াকাণ্ড, সমকামিতা, অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ, গর্ভপাত, যৌন হেনস্থা, শিশু নির্যাতন, এবং যৌনতার মাধ্যমে সংক্রামিত রোগ সম্পর্কে ধারনা দেওয়া হয়। যৌন শিক্ষা হল বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা যা কিনা মানুষের যৌনতার (human sexuality) সাথে সম্পর্কিত। এটা আরও আলোচনা করে সেক্সচুয়াল এনাটমি (sexual anatomy), প্রজননতন্ত্র (sexual reproduction), যৌন কার্যক্রম (sexual activity), প্রজনন স্বাস্থ্য (reproductive health), আবেগিক সম্পর্ক (emotional relations), প্রজনন সংক্রান্ত অধিকার ও দায়িত্ব (reproductive rights and

responsibilities), যৌন সম্পর্ক তৈরি করা থেকে বিরত থাকা (abstinence) এবং জন্ম নিয়ন্ত্রন (birth control) নিয়ে। যৌন শিক্ষা আমরা সাধারণত পেয়ে থাকি আমাদের বাবা-মার কাছে থেকে। বাবা-মা ছাড়া আমাদের দেখা শোনার দায়িত্ব যাদের উপর বর্তায় তাদের কাছ থেকেও আমরা বিষয়টা সম্পর্কে জেনে থাকি। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বয়ঃসন্ধিকালে এই ধরণের বিষয়ে আলোচনা করা হয় না। এই ধরণের বিষয়ভিত্তিক আলোচনা আসলে সামাজিক ট্যাবু।

বেশিরভাগ অভিভাবকই তাদের সন্তানদের বিবাহের পুর্বে এই জাতীয় বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে মুখ খুলতে চান না। কাজেই এমনিতেই অভিভাবকদের মধ্যে একটা নেতিবাচক ধারণা আছে।

এটা কোন মৌলিক বই না, ছেলেরা বড় হচ্ছে দেখে বিভিন্ন লেখকের বই থেকে ও ইন্টারনেট থেকে বয়ঃসন্ধিকালের উপযোগী নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে এবং আমার চিকিৎসা জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে কিশোর কিশোরীদের উপযোগী করে নোট করেছিলাম। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার প্রকাশিত বইয়ের ও পত্রপত্রিকার সাহায্য নিয়েছি, সাথে আমার চিকিৎসা জীবনের অভিজ্ঞতা যুক্ত করেছি। আজ তা বইয়ের রূপ পেল। এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। যাদের লেখনী থেকে সহায়তা নিয়েছি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

অনেক সতর্ক থাকার পরেও আমার অজ্ঞতা, অনিচ্ছাকৃত বা কম্পোজের কারণে বানান/লেখায় ভুল হতে পারে।পরবর্তীতে সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

ডাঃ মোঃ ফাইজুল হক
আয়ুর্বেদিক নিকেতন
এ-৩৮/১, ইসলামপুর, [সরকারি হাসপাতাল ও খাদ্য গোডাউন মোড়ের মাঝে আমবাগান জামে মসজিদের গলী (চার তলা মসজিদ)], ধামরাই, ঢাকা, বাংলাদেশ।
মোবাইলঃ ০১৯৭২-৮৫৯৯৫০, ০১৭১২-৮৫৯৯৫০

বয়ঃসন্ধিকাল ও কৈশোর

বয়ঃসন্ধিকাল (Puberty) প্রতিটি মানুষের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। বয়ঃসন্ধিকালে মানুষের শরীর ও মনে নানা ধরণের পরিবর্তন হতে শুরু করে এবং যৌবনে এসব পরিবর্তনগুলো পূর্ণতা লাভ করে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে ১০ - ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত সময় হচ্ছে কৈশোর (Adolescence)। অর্থাৎ কৈশোর বলতে বয়ঃসন্ধিকালের শুরু থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত সময়কে বোঝায়। এই বয়সে ছেলেদের কিশোর ও মেয়েদের কিশোরী বলা হয়।

বয়ঃসন্ধিকালের শারীরিক পরিবর্তন

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে মেয়ে উভয়ের বিভিন্ন ধরণের শারীরিক পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে যা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এইসব পরিবর্তন নিয়ে লজ্জা-সংকোচ বা দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।

সাধারণত যেসব শারীরিক পরিবর্তন হয় সেগুলো হলো :

কিশোরীদের ক্ষেত্রে –

- উচ্চতা ও ওজন বাড়ে
- স্তন বৃদ্ধি পায়
- বগল ও যোনি অঞ্চলে লোম গজায়
- ঋতুস্রাব বা মাসিক শুরু হয়
- যৌনাঙ্গ বড় হয়
- কোমর সরু হয়
- উরু ও নিতম্ব ভারী হয় জরায়ু ও ডিম্বাশয় বড় হয়।

কিশোরদের ক্ষেত্রে –

- উচ্চতা ও ওজন বাড়ে
- লিঙ্গ ও অন্ডকোষ বড় হয়
- বগল ও লিঙ্গ অঞ্চলে লোম গজায়
- দাড়ি-গোঁফ গজায়
- হাত-পায়ের লোম গাঢ় হয়
- বুকে লোম গজায়

- ❖ বুক ও কাঁধ চওড়া হয়
- ❖ কন্ঠস্বর পরিবর্তন হয়
- ❖ বীর্য উৎপাদন ও স্বপ্নদোষ শুরু হয়।

সবার ক্ষেত্রে পরিবর্তনগুলো একই সময়ে ও একই রকম নাও হতে পারে। যেমন- কিশোরীদের ক্ষেত্রে কারো আগে আবার কারো একটু বেশি বয়সে মাসিক শুরু হতে পারে। স্তন বৃদ্ধি একেক জনের একেক রকম হতে পারে। কিশোরদের ক্ষেত্রে একেক জনের উচ্চতা একেক রকম হতে পারে। সবারই বুকে, হাত-পায়ে লোম গাঢ় নাও হতে পারে। লিঙ্গের আকার কারো বড় আবার কারো ছোট হতে পারে। এসব নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। মনে রাখতে হবে এই পরিবর্তনগুলো অত্যন্ত স্বাভাবিক।

বয়ঃসন্ধিকালের মানসিক পরিবর্তন

বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তনের পাশাপাশি নানা ধরণের মানসিক পরিবর্তনও হয়। এই পরিবর্তন স্বাভাবিক এবং সময়ের সাথে সাথে কিশোর-কিশোরীরা এইসব পরিবর্তনগুলোর সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে।

যখন একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে তখন সে শারীরিক এবং মানসিকভাবে সম্পূর্ণ অসহায় থাকে। বাবা-মা বা পরিবারের অন্যান্য সদস্য তখন তার দেখাশোনা করেন। সে ধীরে ধীরে বড় হয়, বুঝতে শেখে, শারীরিক ও মানসিকভাবে তার বিভিন্ন পরিবর্তন হয়। পরিবর্তনের সময়ে ছেলে-মেয়েরা নিজেদেরকে বড় ভাবতে শুরু করে এবং নিজেদের মতো করে চলতে চায়। বেশিরভাগ সময়ে দেখা যায় যে বাবা-মায়েরা তাদের এ চলাফেরা মেনে নিতে পারেন না। সে জন্যই এ সময়ে বড়দের সাথে একটা দূরত্ব তৈরি হয়।

সাধারণত যেসব মানসিক পরিবর্তন দেখা যায় সেগুলো হলোঃ

- ❖ অজানা বিষয়ে জানার কৌতূহল বাড়ে
- ❖ চলাফেরায় চঞ্চলতা বাড়ে
- ❖ স্বাধীনভাবে চলতে ইচ্ছা করে
- ❖ আবেগে দ্রুত পরিবর্তন দেখা দেয়। যেমন- কখনো মন চঞ্চল হয় আবার কখনো বিষন্ন হয়।

- ❖ কেউ কেউ নিজেকে আড়াল করে রাখতে ভালোবাসে
- ❖ বিভিন্ন শারীরিক পরিবর্তনের কারণে লাজুকভাব বেড়ে যায়
- ❖ নানা ধরণের দ্বিধাদ্বন্ধ ও অস্থিরতা কাজ করে
- ❖ সৌন্দর্য সচেতনতা বাড়ে
- ❖ বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে
- ❖ যৌন বিষয়ে চিন্তা আসে।

কৈশোরের ঝুঁকি

কৈশোরে কিশোর-কিশোরীদের অনেক অজানা বিষয়ের মুখোমুখি হতে হয়। অনেক সময় কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে তারা নতুন অভিজ্ঞতা লাভের চেষ্টা করে যার পরিণতি সব সময় ভাল নাও হতে পারে। এছাড়াও সঠিক জ্ঞানের অভাবে কখনো কখনো তারা ভুল সিদ্ধান্তও নিতে পারে। এক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েদের মনে রাখতে হবে। তাদের সবচাইতে ভাল বন্ধু মা-বাবা ও বড় ভাই-বোন। তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করতে পারলে তারা তাদের সঠিক জ্ঞান দেয়ার পাশাপাশি সঠিক পথ দেখাতেও সাহায্য সহযোগিতা করতে পারেন।

কিশোর-কিশোরীরা সাধারণত যেসব ঝুঁকির সম্মুখীন বেশি হয় সেগুলো হলোঃ

- ❖ বন্ধু-বান্ধবদের চাপে পড়ে তারা বিপদজনক কাজে জড়িয়ে যেতে পারে।
- ❖ কৌতুহল বশে বা অসৎ সঙ্গে পড়ে ধূমপান, মাদকাসক্তি, অনিরাপদ যৌন-আচরণসহ নানা ধরণের অসামাজিক কাজে জড়িয়ে যেতে পারে।
- ❖ নিকট আত্মীয় অথবা অপরিচিতজন দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হতে পারে।
- ❖ প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে প্রজননতন্ত্রে নানা ধরণের রোগ সংক্রমণ বা অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণের মতো ঝুঁকির সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

ঝুঁকি প্রতিকারে করণীয়

কৈশোরে বন্ধু-বান্ধব থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এ সময় নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা কাজে লাগিয়ে বুঝতে হবে কোন কাজটি ভাল এবং কোনটি ভাল নয়। বন্ধু-

বান্ধবদের চাপে বা কৌতুহলের বশবর্তী হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত নয়। ভাল-মন্দ বিচার-বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বাবা-মা, ভাই-বোন সকলের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন। মনে কোনো প্রশ্ন জাগলে কিংবা কোনো সমস্যায় পড়লে তাদের সাথে খোলামেলা আলোচনা করতে হবে এবং তাদের সাহায্য-সহযোগিতা চাইতে হবে।

পড়াশোনা, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে নিজেকে বেশি নিয়োজিত রাখতে হবে; যাতে বিপদজনক বা অসামাজিক কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা যায়।

প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সঠিক তথ্য জেনে সেগুলো মেনে চলতে হবে।

কোন আত্মীয় অথবা পরিচিত/ অপরিচিত ব্যক্তি দ্বারা কিশোর-কিশোরীরা যৌন নির্যাতনের শিকার হতে পারে। তাই বাবা-মাকে এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।

জেন্ডার (Gender) ধারণা

ছেলে ও মেয়েশিশু উভয়েই সমান সম্ভাবনা নিয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এবং তারা সব ধরণের কাজই করতে পারে। শুধুমাত্র শারীরিক কিছু পার্থক্য ছাড়া ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য থাকেনা। শারীরিক এই পার্থক্যের কারণে মেয়েরা সন্তান জন্ম দিতে পারে অন্যদিকে ছেলেরা ভ্রুণ উৎপাদনে ভূমিকা রাখে। প্রকৃতিগত এই পার্থক্যকে ভিত্তি করে সমাজে ছেলে আর মেয়ের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা গড়ে ওঠে। সামাজিকভাবে আরোপিত ছেলে-মেয়ের এই পরিচয় ও তাদের ভূমিকাকেই জেন্ডার বলে।

ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ

আমাদের দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছেলে এবং মেয়েকে সমান চোখে দেখা হয়না। মেয়ে শিশুদের প্রতি অযত্ন আর অবহেলা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষা, পুষ্টি, চিকিৎসা সব ক্ষেত্রেই অবহেলার শিকার হয় মেয়েরা। ফলে সমান সম্ভাবনা থাকার পরও একটি মেয়ে একটি ছেলের মত একইভাবে দক্ষ হয়ে বেড়ে উঠতে না পেরে পদে পদে সে পিছিয়ে পড়ে। অথচ যথাযথ সুযোগ পেলে উভয়ই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

আমাদের সমাজে সাধারণত মেয়ে আর ছেলের মধ্যে যে ধরণের বৈষম্য দেখা যায় সেগুলো হলো :

পুষ্টি : বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের শরীর দ্রুত বাড়ে তাই এ সময়ে উভয়েরই প্রচুর আমিষ ও ভিটামিনযুক্ত খাবার প্রয়োজন। তবে আমাদের পরিবারগুলোতে প্রায়ই দেখা যায়, তারা ছেলেকে বেশি খাবার দেয় কিন্তু মেয়ের পর্যাপ্ত খাবারের ব্যাপারে উদাসীন থাকে, ফলে মেয়েটি অপুষ্টিতে ভুগতে থাকে। শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে বেড়ে ওঠে।

শিক্ষা : পরিবারে একটি মেয়ে যখন বড় হয়ে ওঠে তখন ধরে নেয়া হয় সে বিয়ের জন্য উপযুক্ত হয়েছে, সুতরাং তার আর লেখাপড়ার দরকার নেই। এছাড়াও রাস্তাঘাটে মেয়েদের নিরাপত্তার অভাবে অনেক সময় স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে জীবন গঠনে বা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে একটি মেয়ে ছেলেদের চাইতে বরাবরই পিছিয়ে থাকে।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা : স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রেও মেয়েরা অবহেলার শিকার হয়ে থাকে। দেখা যায় একটি ছেলে অসুস্থ হলে তাকে ডাক্তার দেখানো হচ্ছে কিন্তু মেয়েকে সহজে ডাক্তারের কাছে নেয়া হচ্ছে না। এমনকি গর্ভাবস্থায়ও তার সঠিক যত্ন নেয়া হয়না। এর কুফল একটি মেয়ে সারাজীবন ভোগ করে।

মর্যাদাবোধ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ : অনেক সময় ছোটবেলা থেকেই একটি মেয়েকে পরিবারে খাটো করে দেখা হয়, ভাল কাজের স্বীকৃতি দেয়া হয়না এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও তাকে অবহেলা করা হয়। এভাবে মর্যাদাহীনভাবে বেড়ে উঠতে উঠতে মেয়েরা মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কখনো কখনো নিজের মর্যাদা বা অধিকারও বুঝতে পারেনা।

মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা : ছোট-বড় কোনো ধরণের কাজেই মেয়েদের মতামতের কোনো মূল্য অনেক পরিবারের সদস্যরা দেয়না। যেমন- মেয়ের অমতে বিয়ে দেয়া, লেখাপড়া বন্ধ করে দেয়া, খেলাধুলা করতে না দেয়া, অল্প বয়সে বিয়ে দেয়া ইত্যাদি।

সম্পদ বন্টন বা নিয়ন্ত্রণ : বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিবারে মেয়েরা তার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। দেখা যায় পরিবারের অন্যান্য মহিলা সদস্যরাও নিজেদের অধিকার সম্পর্কে অসচেতনতার

কারণে ধরে নেন সম্পত্তিতে শুধুমাত্র ছেলেদেরই অধিকার রয়েছে। ফলে ধীরে ধীরে পারিবারিক ও সামাজিক চাপে মেয়েদের এটা মেনে নিতে হয়।

কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য : কাজের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়েরই সমান অধিকার রয়েছে কিন্তু আমাদের দেশে এই অধিকার প্রতি মূহুর্তেই লঙ্ঘিত হচ্ছে। দেখা যায় একটি ছেলে আর একটি মেয়ে একই কাজ করছে কিন্তু তাদেরকে পারিশ্রমিক একই রকম দেয়া হচ্ছে না।
মেয়েরা যখন গর্ভবর্তী হচ্ছে তখন তাকে তার প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা দেয়া হচ্ছে না। এমন কি কখনো কখনো মেয়েটি চাকরি হারাচ্ছে। মনে রাখতে হবে কর্ম-সংস্থান সকল মানুষের মৌলিক অধিকার।

প্রজনন অধিকার : প্রত্যেক নারী-পুরুষেরই প্রজনন অধিকার যেমন - উপযুক্ত বয়সে বিয়ের অধিকার, সে কখন, কয়টি সন্তান নিতে চান সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার এবং তথ্য ও সেবা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। অথচ আমাদের দেশের মেয়েরা প্রায়ই এই তথ্য ও সেবা পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বৈষম্যমূলক আচরণ দূর করতে করণীয়

১) কিশোর-কিশোরী উভয়কেই ছেলে ও মেয়ের সমান সুযোগ পাওয়ার অধিকার' এই বিষয়টিকে উপলব্ধি করতে হবে।

২) কিশোর-কিশোরীদের বিশেষ করে কিশোরীদের মা-বাবা বা অভিভাবকদের সাথে খোলামেলা আলোচনা করে বোঝাতে হবে যে, একজন মেয়েও সুযোগ পেলে ছেলের মতো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এক্ষেত্রে বাবা-মা'র মতামতের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হয়ে তাদের কাছে সাহায্য-সহযোগিতা চাইতে হবে।

৩) সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী একজন কিশোরীকে লেখাপড়া ও অন্যান্য ভাল কাজ দিয়ে নিজেকে তৈরি করতে হবে। যাতে ভবিষ্যতে একজন পুরুষের পাশাপাশি তারও মাথা উঁচু করে চলার ক্ষমতা থাকে।

৪) পরিবারের নারী সদস্যদের প্রতি কিশোরদের শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। একজন কিশোরকে লক্ষ্য রাখতে হবে বাড়িতে কোনো কিশোরী বোন বা আত্মীয়া থাকলে সে যেনো তার মতোই খাবার, শিক্ষা, চিকিৎসা, মতামত দেয়ার স্বাধীনতা, মানমর্যাদা ইত্যাদি পায়।

৫) রাস্তা-ঘাটে কিশোরীদের উত্যক্ত করা, বাজে মন্তব্য বা ইভটিজিং/ টিটকিরি করা থেকে একজন কিশোরকে বিরত থাকতে হবে এবং বন্ধুকেও বিরত থাকতে বলতে হবে।

কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য

বয়ঃসন্ধিকালেই কিশোর-কিশোরীরা প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে। তাই এসময় থেকেই প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন অবিবাহিত ছেলে-মেয়েদের প্রজনন শিক্ষা ও প্রজননতন্ত্রের সুস্থতা বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন নেই। এ ধারণা সঠিক নয়; কারণ প্রজননক্ষম হবার সাথে সাথেই প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেলে কিশোর-কিশোরীরা ভালভাবে নিজেদের যত্ন নিতে এবং লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে সুস্থ-সুন্দর ভবিষ্যত গড়ে তুলতে পারবে।

প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনীয়তা

কিশোর-কিশোরীদের সুস্বাস্থ্যের জন্য অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করাও জরুরি। সময়মত ও সঠিক প্রজননস্বাস্থ্য সেবার অভাবে কিশোর-কিশোরীরা মারাত্মক জটিলতার সম্মুখীন হতে পারে।

প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কিশোর-কিশোরীরা লজ্জা-সংকোচ বা ভয়ে প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যা বা বিষয়গুলো নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। কখনো কখনো তারা হাতুড়ে ডাক্তার,রাস্তার ক্যানভাসার, হাতুড়ে হাকিম কবিরাজ বা ওঝার স্মরণাপন্ন হয়, এতে তারা ভুল চিকিৎসা ও প্রতারণার শিকার হয়।

আমাদের দেশে অনেক মেয়েরই কৈশোরে বিয়ে হয়ে যায়। এদের জন্য প্রজননস্বাস্থ্য সেবার প্রয়োজন। সাধারণত কিশোর কিশোরীদের যে ধরণের প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার প্রয়োজন হয় সেগুলো হলোঃ

১) প্রজননস্বাস্থ্য বিষয়ে তথ্য ও পরামর্শ;

২) প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনরোগের চিকিৎসা;

৩) পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সেবা;

৪) গর্ভাবস্থায়, প্রসবের সময় ও প্রসব পরবর্তী সেবা।

প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে করণীয়

১) প্রজনন স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কিত এমন কোনো স্বাস্থ্য সেবার প্রয়োজন হলে লজ্জা, সংকোচ বা ভীত না হয়ে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তার বা স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মীর সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

২) আমাদের দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে অনেক সময় কিশোর-কিশোরীদের পক্ষে নিজের উদ্যোগে স্বাস্থ্যসেবা নেয়া সম্ভব নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে মা-বাবা বা পরিবারের বিশ্বস্ত বড় কারোর সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

৩) ডাক্তার বা স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মীর কাছে কোনো কিছু গোপন না করে সব কথা খুলে বলতে হবে, যাতে তারা সঠিক পরামর্শ ও সেবা দিতে পারেন।

৪) ডাক্তার বা স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মীর পরামর্শ মতে চিকিৎসা সেবা নিতে হবে।

প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষায় করণীয়

১) পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা;

২) নিরাপদ যৌন আচরণ সম্পর্কে জানা ও তা মেনে চলা;

৩) প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ, যৌনরোগ সম্পর্কে জানা ও প্রতিরোধ করা;

৪) প্রয়োজন অনুযায়ী প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করা।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা বয়ঃসন্ধিকালের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।শিশুকালে মা-বাবা বা অভিভাবকরা ছেলে-মেয়ের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে খেয়াল রাখেন। কৈশোর থেকে এই দায়িত্ব নিজেকে নিতে হয়। নিয়মিত গোসল করা, পরিষ্কার জামা-কাপড় পরা, দাঁত মাজা, নখ কাটা, চুল, চোখ, নাক ও কানের যত্ন নেয়া, হাত ধোয়া ইত্যাদির পাশাপাশি প্রজনন অঙ্গের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস কৈশোর থেকেই গড়ে তোলা আবশ্যক।

এসময় ছেলে-মেয়েদের ঘাম বেশি হয় এবং চামড়া তেলতেলে হয়। শরীরের ঘামে, বিশেষ করে বগলের নিচের ঘামে কিছুটা দুর্গন্ধ হতে পারে। তাই নিয়মিত সাবান দিয়ে গোসল করা প্রয়োজন।

শরীরের যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢাকা থাকে প্রতিদিন সেগুলোও পরিষ্কার রাখতে হয়। এজন্য প্রতিদিন পরিষ্কার পানি ও সাবান দিয়ে গোসল করা, যৌনাঙ্গ (গোপন অঙ্গ) পরিষ্কার রাখা,প্রতি মাসে একবার নাভির নিচের ও বগলের পশম/চুল/লোম সেভ করে পরিস্কার করা, হাত-মুখ ধোয়া, পরিষ্কার কাপড় পরা, পরিষ্কার জিনিস ব্যবহার করা দরকার।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য করণীয়

কিশোরীদের মাসিক চলাকালে পরিষ্কার কাপড় বা প্যাড ব্যবহার করতে হয়। মাসিকের সময় ব্যবহৃত কাপড় বা প্যাড প্রয়োজন অনুযায়ী বদলাতে হয়। মাসিকের সময় যদি কাপড় ব্যবহার করা হয় তবে তা পুনরায় ব্যবহারের আগে অবশ্যই সাবান দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে পরিষ্কার কোনো জায়গায় রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। একটি প্যাড মাত্র একবারই ব্যবহার করা যায়। পরিষ্কার কাপড় বা প্যাড ব্যবহার না করার কারণে প্রজনতন্ত্রের সংক্রমণ হতে পারে যা শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

কিশোরদের স্বপ্নদোষের ফলে পরার কাপড় নষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। এ ধরণের অবস্থা হলে অবশ্যই সেই কাপড় ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। অপরিষ্কার প্যান্ট বা লুঙ্গি পরার কারণে নানা ধরণের চুলকানি-পাঁচড়া জাতীয় সংক্রমণ হতে পারে এবং তা মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে।

নিরাপদ যৌন আচরণ

কৈশোরে কিশোর-কিশোরীদের বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ ও যৌনচিন্তার সৃষ্টি হয়। তাই এ সময়ে যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লে তা শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক, ধর্মীয় সবদিক দিয়েই ক্ষতিকর হতে পারে। তারা অনেক সময় যৌন নির্যাতনের শিকার হয় এবং লক্ষ্য করা যায় এই যৌন নির্যাতনকারীরা তাদের নিকট আত্মীয় বা পরিচিত জন। ভয়ে, লজ্জায় কিশোর-কিশোরীরা এসব নির্যাতনের কথা প্রকাশ না করে নিরবে সহ্য করে। যার পরিণতিতে মানসিক ভারসাম্যহীনতা, অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ ও যৌনরোগের মতো মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয়।

আমাদের দেশে অধিকাংশ মেয়েরই (৬৪ শতাংশ) ১৮ বছর বয়সের আগে বিয়ে হয়ে যায়। অল্প বয়সে বিয়ের কারণে তাদের অনেকে কৈশোরে গর্ভধারণ

করে। অথচ একটি কিশোরীর শরীর বা মন কোনোটাই তখন মা হবার জন্য উপযুক্ত নয় বলে নানা ধরণের জটিলতা দেখা দেয়। আমাদের দেশে মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ এই অল্প বয়সে অর্থাৎ কৈশোরে বিয়ে ও গর্ভধারণ।

নিরাপদ যৌন আচরণের জন্য করণীয়

১) ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন এবং শারীরিক ক্ষতির কথা বিবেচনা করে কিশোর-কিশোরীদের এ বয়সে যৌন আচরণের ক্ষেত্রে সংযত থাকাসহ পারিবারিক নৈতিক শিক্ষায় দিক্ষিত হতে হবে।

২) যৌন চিন্তা মনে যাতে কম আসে সে জন্য পড়াশোনা, খোলাধুলা, সাংস্কৃতিক চর্চাসহ অন্যান্য সৃজনশীল কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে।

৩) অশ্লীল বইপত্র এবং ভিডিও বা সিনেমা দেখা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৪) যৌন নির্যাতনের শিকার হলে অবশ্যই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মা-বাবা বা বিশ্বস্ত কাছের ব্যক্তিকে বিষয়টি জানাতে হবে। অবশ্যই মনে রাখতে হবে নির্যাতনকারীই দোষী, যে নির্যাতিত হয় সে দোষী নয়।

৫) মেয়েরা ১৮ বছর এবং ছেলেরা ২১ বছর হওয়ার আগে বিয়ে করবে না; কারণ তা আইনত দন্ডনীয় এবং স্বাস্থ্যগত কারণে ঝুঁকিপূর্ণ।

৬) কোনো কারণে যদি এর আগে বিয়ে হয়েই যায় তবে অবশ্যই পরিবার পরিকল্পনা কর্মীর পরামর্শ মতো জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে।

৭) হস্তমৈথুন করা (হাত দিয়ে) বীর্য বের করা মুসলমানদের জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) কাজ। এটা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে পরিমিত অর্থাৎ সপ্তাহে একদিন করলে কোনো স্বাস্থ্যগত সমস্যা হয়না, কিন্তু আমাদের ইসলাম ধর্মে নিষেধ হওয়ার কারনে এটা থেকে দূরে থাকবে।

৮) সমকামিতা (ছেলেরা ছেলেরা অথবা মেয়েরা মেয়েরা যৌন সম্পর্ক করা) এক ধরনের যৌন বিকৃতি ও ভয়ানক পাপের কাজ। এতে অনেক স্বাস্থ্যঝুঁকি আছে, এমন কাজ করলে শারীরিক সমস্যা সহ অনেক যৌনরোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই এসব কাজ থেকে দূরে থাকবে।

৯) বিয়ের আগে যৌন সম্পর্ক করা ধর্মীয়, সামাজিক ও আইনগত ভাবে নিষেধ, এ কাজ করলে শারীরিক সমস্যা সহ অনেক যৌনরোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

১০) ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলবে।

যৌন নিপীড়ন

অনেক সময় কিশোর-কিশোরী, বিশেষ করে মেয়েদেরকে রাস্তাঘাটে, বাসে বা অন্যান্য স্থানে ছেলেদের কাছ থেকে কিছু অস্বস্তিকর আচরণ, কথাবার্তা, মন্তব্য কিংবা শারীরিক স্পর্শের সম্মুখীন হতে হয়। একে যৌন নিপীড়ন বলে। যৌন নিপীড়ন অনেকভাবেই হতে পারে।

নারী-পুরুষ যে কেউ যে কোন সময় যৌন নিপীড়নের শিকার হতে পারে। তবে শিশু, কম বয়সী ছেলে বা মেয়ে এই অবস্থার মুখোমুখি বেশি হয়। দেখা গেছে পরিচিত লোকজন, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনেরাই যৌন নিপীড়ন করে থাকে। সাধারণত: যৌন নিপীড়নকারীরা শিশু বা কম বয়সী ছেলে-মেয়েদের ভয়, প্রলোভন, চাপ বা হুমকি দেয় এ ধরনের ঘটনা কাউকে না বলার জন্য। কিন্তু এরকম হলে চুপচাপ না থেকে বা ভয় না পেয়ে অভিভাবক বা বড় কাউকে বলা উচিত এবং সেই সাথে সমবয়সী ও পরিচিতদেরও তার সম্বন্ধে বলে দেয়া উচিত যেন তারাও তার সম্বন্ধে সাবধান থাকতে পারে। মনে রাখবে, যে যৌন নিপীড়ন করে সেই দোষী, যাকে করা হয় তার কোনো দোষ নেই।

যৌন নিপীড়ন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একা একা কারো সাথে মেলামেশা না করে বা বেড়াতে না গিয়ে সবাই মিলে যাওয়া উচিত। এছাড়া যৌন নিপীড়ন করে এমন কারো সম্বন্ধে জানা থাকলে বা সেরকম সন্দেহ থাকলে তার সাথে একা গল্প করবে না বা বেড়াতে যাবে না।

অনেক সময় যৌন নিপীড়নের শিকার হয়ে অনেক মেয়ে বা ছেলে মানসিকভাবে কষ্ট পায়, আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে এবং স্বাভাবিক হতে পারে না। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ এরকম ঘটনার শিকার হয় তবে এ অবস্থায় তাকে সান্ত্বনা দেবে, সমবেদনা জানাবে যেন সে এ অবস্থা থেকে নিজেকে সামলে নিতে পারে। সবসময় মনে রাখবে, যে যৌন নিপীড়ন করে সেই দোষী, তার সম্বন্ধে সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে এবং নিজেদের সচেতন হয়ে চলতে হবে।

প্রজননতন্ত্র

নারী ও পুরুষের যেসব অঙ্গের মাধ্যমে সন্তানের জন্ম হয় সেসব অঙ্গকে প্রজনন অঙ্গ বলে এবং এইসব অঙ্গগুলোকে একত্রে প্রজননতন্ত্র বলা হয়। নারী ও পুরুষের প্রজনন অঙ্গগুলো ভিন্ন হয়ে থাকে।

তোমাদের মতো ছেলে-মেয়েদের নিজেদের দেহ সম্পর্কে কৌতূহল থাকে। দেহের ভিতরে কি আছে তা তোমরা জানতে চাইতে পারো। নিজের দেহ সম্পর্কে জানতে চাওয়া ভালো এবং এতে লজ্জিত হবার কিছু নেই।

তোমরা জানো, নতুন একটি শিশু পৃথিবীতে আসার জন্য নারী ও পুরুষ দু'জনেরই প্রয়োজন। মেয়েদের গর্ভধারণ থেকে শুরু করে সন্তান জন্ম হওয়ার জন্য এই পুরো প্রক্রিয়ায় নারী ও পুরুষের শরীরের যেসব অঙ্গ জড়িত এগুলোকে একসাথে প্রজননতন্ত্র বলে।

নারী ও পুরুষ ভেদে প্রজননতন্ত্রকে দুইভাগে ভাগ করা যায়- স্ত্রী বা মেয়েদের প্রজননতন্ত্র এবং পুরুষ বা ছেলেদের প্রজননতন্ত্র।

ছেলেদের প্রজননতন্ত্র

ছেলেদের প্রজননতন্ত্রের অনেকগুলি অংশ রয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকটি অংশ তোমরা বাইরে থেকে দেখতে পাও এবং কয়েকটি অংশ দেহের ভিতরে থাকে যা বাইরে থেকে দেখা যায় না।

ছেলেদের দেহের নিচের দিকে একটি ঝুলন্ত থলি আছে, যাকে অণ্ডকোষের থলি বলে। এ থলির ভিতরে দুটো গোলাকার অণ্ডকোষ বা টেস্টিস ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। একজন ছেলে যখন বড় হয় তখন এ অণ্ডকোষ থেকেই শুক্রাণু তৈরি হয়। এই শুক্রাণু যৌনমিলনের মাধ্যমে মেয়েদের ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে সন্তান সৃষ্টি হয়। শুক্রাণু তৈরির এ প্রক্রিয়া সারাজীবন চলতে থাকে।

অণ্ডকোষে শুক্রাণু তৈরি হবার পরে শুক্রবাহী নালী দিয়ে বের হয়ে এ শুক্রাণু বীর্যের সাথে মিলিত হয়। ছেলেদের দেহের নিচের দিকে তলপেটে দু'টি বীর্যথলি আছে যা থেকে এক রকম পিচ্ছিল রস তৈরি হয়। এ রসকেই বীর্য বা সিমেন (ঝবসবহ) বলে। ছেলেরা বড় হবার পরে কোনো কারণে যৌনউত্তেজনা হলে পুরুষাঙ্গ থেকে এ বীর্য বের হয়। বীর্য এবং প্রস্রাব একই পথে বের হয় তবে তারা একসঙ্গে বের হয় না।

ছেলেদের প্রজননতন্ত্রের একটি বিশেষ অংশ হলো পুরুষ লিঙ্গ বা পুরুষাঙ্গ। প্রস্রাব ও যৌনমিলন উভয় কাজেই পুরুষাঙ্গ ব্যবহৃত হয়। এর আকার বা আকৃতি সবার এক রকম হয় না। স্বাভাবিক অবস্থায় পুরুষাঙ্গ নরম থাকে কিন্তু কোনো কারণে উত্তেজিত হলে এটি শক্ত এবং বড় হয়ে যায়।

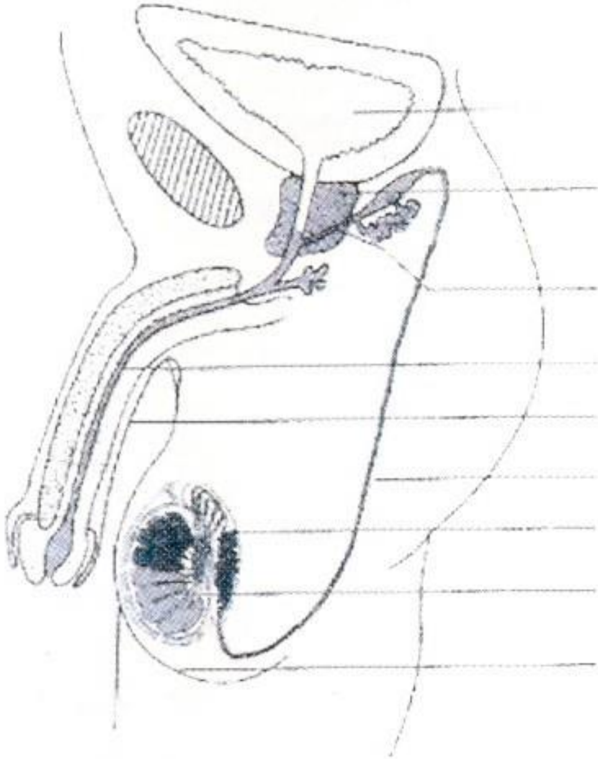

মেয়েদের প্রজননতন্ত্র

স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের অনেকগুলি অংশ রয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকটি অংশ তোমরা বাইরে থেকে দেখতে পাও এবং কিছু অংশ যা ভিতরে রয়েছে তা বাইরে থেকে দেখা যায় না। যেমন- মেয়েদের তলপেটের দুই পাশে দু'টো ডিমের থলি আছে। এই ডিমের থলি দু'টিকে ওভারি বলে। প্রতিটি মেয়ে যখন বড় হয় তখন প্রত্যেক মাসে এই ডিমের থলিতে একটি করে ডিম পাকে।

দুই ওভারির মাঝখানে, তলপেটে একটি জরায়ু (বাচ্চাদানী) আছে। এ জরায়ুতেই মাসিকের রক্ত তৈরি হয়। এবং মায়ের পেটে শিশু বড় হয়। জরায়ুর ওপরের দিকে দুই পাশে থেকে দু'টো নালী শুরু হয়ে ওভারি বা ডিমের থলির কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। এ নালী দু'টিকে ডিম্ববাহী নালী বা ফ্যালোপিয়ান টিউব বলে।

প্রতি মাসে ডিমের থলিতে যখন একটি করে ডিম পাকে তখন তা এই নালী দিয়ে জরায়ুতে আসে।

জরায়ুর নিচে মেয়েদের বাচ্চা হবার রাস্তা বা যেনিপথ আছে। এ যোনিপথ ওপরে জরায়ুর সাথে যুক্ত থাকে এবং নিচের দিকে ছোট একটি ছিদ্র হয়ে বাইরে এসে শেষ হয়েছে। এ যোনিপথের অনেকগুলো কাজ রয়েছে। যেমন প্রতিমাসে মাসিকের রক্ত এ পথ দিয়ে বের হয়; এ পথে যৌনমিলন হয় এবং এ পথেই একটি শিশু মায়ের পেট থেকে বের হয়ে আসে।

মেয়েদের দেহের নিচের দিকে যোনিপথের মুখ ছাড়াও আরো দু'টি ছিদ্রপথ আছে। যোনিপথের সামনের ছিদ্রটি মূত্রনালীর মুখ, যার মাধ্যমে প্রস্রাব বেরিয়ে আসে এবং পিছনের ছিদ্রটি পায়ুপথের মুখ, যার মাধ্যমে আমরা মলত্যাগ করে থাকি।

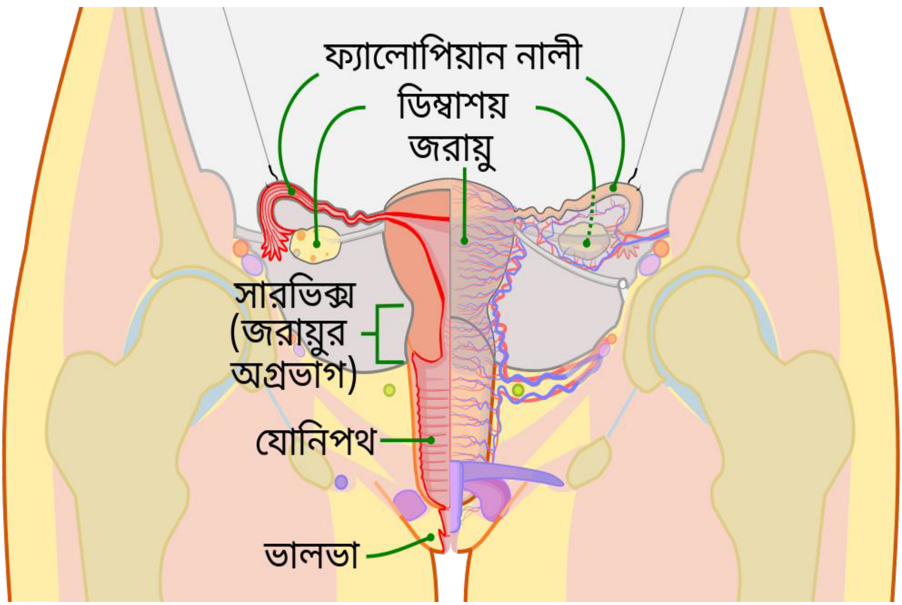

মেয়েদের মাসিক বা ঋতুস্রাব

মাসিক বা ঋতুস্রাব মেয়েদের দেহের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এবং স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার লক্ষণ। সাধারণত ১০-১২ বছর বয়সে মাসিক শুরু হয় এবং ৪৫-৪৯ বছর বয়সে স্বাভাবিক নিয়মেই তা বন্ধ হয়ে যায়। স্বাভাবিক

অবস্থায় মাসিক প্রতিমাসেই হয়ে থাকে এবং ৪ থেকে ৬ দিন স্থায়ী হয়। মেয়েদের প্রতি ২৪ থেকে ৩২ দিন অর্থাৎ গড়ে ২৮ দিন পর পর মাসিক হয়। একে মাসিকচক্র বলে। মাসিক শুরু হওয়ার দিন থেকেই মাসিক চক্র শুরু হয়। মাসিকের প্রথম দিন থেকেই ডিম্বাশয় ডিম্বাণু তৈরি হতে শুরু করে। মাসিক হওয়ার পরে মেয়েরা প্রজনন অর্থাৎ সন্তান ধারণের ক্ষমতা লাভ করে। মাসিক নিয়ে ভয় বা লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই।

প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনরোগ

অনেক সময় এই প্রজননতন্ত্রের অঙ্গ জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয়ে নানা ধরণের স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি করে। এসকল সংক্রমণের মধ্যে রয়েছে যৌনরোগ এবং অন্যান্য সংক্রমণ। যৌনমিলনের মাধ্যমে যেসব সংক্রমণ বা রোগ হয় তাকে যৌনরোগ বলে।

এছাড়া অন্যান্য ভাবেও প্রজননতন্ত্রের প্রদাহ হতে পারে। যেমন সিফিলিস, গনোরিয়া, ক্ল্যামিডিয়া, যৌনাঙ্গে ফুসকুড়ি, এইচআইভি ও এইডস এবং হেপাটাইটিস বি, সি ইত্যাদি। তবে হেপাটাইটিস এবং এইচআইভি ও এইডসসহ কিছু যৌনরোগ যৌন মিলন ছাড়া অন্যভাবেও সংক্রমিত হতে পারে, যেমন- আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ, তার ব্যবহৃত সুচ বা সিরিঞ্জ ব্যবহারের মাধ্যমে এবং আক্রান্ত মা থেকে সন্তানের মাঝে ছড়াতে পারে।

যৌনরোগ ছাড়া অন্যান্য সংক্রমণ মাসিকের সময় অপরিষ্কার কাপড় ব্যবহার করলে এবং প্রসব বা গর্ভপাতের সময় নিরাপদ ব্যবস্থা গ্রহণ না করলেও হতে পারে।

প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ বা যৌনরোগ হলে সাধারণতঃ পুরুষের ক্ষেত্রে যে ধরণের লক্ষণ দেখা যায় সেগুলো হলোঃ

১) প্রস্রাবের রাস্তায় পুঁজ
২) পুরুষাঙ্গে ঘা বা ক্ষত
৩) অন্ডকোষ ফুলে যাওয়া ও ব্যথা
৪) ঘন ঘন প্রস্রাব
৫) প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া এবং ব্যথা
৬) কুচকি ফুলে যাওয়া ও ব্যথা কোনো কোনো ক্ষেত্রে জ্বর।

প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ বা যৌনরোগ হলে সাধারণত নারীদের ক্ষেত্রে যে ধরণের লক্ষণ দেখা যায় সেগুলো হলো :

১) যোনিপথে দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব
২) যৌনাঙ্গে ক্ষত বা ঘা
৩) যোনিপত্রে চুলকানি ও জ্বালাপোড়া
৪) তলপেটে খুব ব্যথা
৫) কুচকি ফুলে যাওয়া ও ব্যথা
৬) সহবাসের সময় ব্যথা
৭) কোনো কোনো ক্ষেত্রে জ্বর।

বিঃদ্রঃ সকলের ক্ষেত্রে সকল উপসর্গ একই রকম নাও হতে পারে। আবার সকল উপসর্গ এক সঙ্গে নাও থাকতে পারে। কিছু কিছু প্রজননতন্ত্রের প্রদাহ যেমন, ক্ল্যামিডিয়া ইনফেকশন বিশেষ কোন উপসর্গ ছাড়াই দীর্ঘদিন বিদ্যমান থাকতে পারে যা সঠিক সময়ে চিকিৎসা না করালে দীর্ঘমেয়াদী জটিলতা দেখা দিতে পারে।

অনেক সময় যৌনরোগ থাকলেও শরীরে কোনো লক্ষণ থাকে না বা সমস্যা দেখা দেয় না। সমস্যা না থাকায় যার যৌনরোগ আছে, সে নিজেও বুঝতে পারে না যে তার এ রোগ হয়েছে। আবার অনেকে যৌনরোগের লক্ষণগুলো ভালোভাবে জানে না, তাই যৌনরোগ হলে বুঝতেও পারে না। এ রকম অবস্থায় তার সাথে যৌনমিলন হলে রোগ তার কাছ থেকে অন্যজনের মধ্যে ছড়িয়ে যায়।

গনোরিয়া

পুরুষ :

১) যৌনাঙ্গ থেকে পুঁজ বা পুঁজের মতো স্রাব যাওয়া
২) পেশাব করার সময় জ্বালা-পোড়া ও ব্যথা করা।
৩) ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া।

মহিলা :

১) যোনিপথে সাদা পুঁজের মতো হলুদ স্রাব যাওয়া।

২) পেশাব করার সময় জ্বালা-পোড়া ও ব্যথা করা।

৩) ঘন ঘন পেশাব হওয়া।

৪. যৌন মিলনের সময় ব্যথা ও কষ্ট হওয়া।

(তবে বেশিরভাগ সময় মেয়েদের কোন লক্ষন থাকে না)

ক্লামাইডিয়া

পুরুষ :

১) যৌনাঙ্গ থেকে পুঁজ বা পুঁজের মতো স্রাব যাওয়া

২) পেশাব করার সময় জ্বালাপোড়া ও ব্যথা করা।

৩) অণ্ডকোষ ফুলে যাওয়া।

৪) ঘন ঘন পেশাব হওয়া।

মহিলা :

১) যোনিপথে সাদা স্রাব যাওয়া।

২) পেশাব করার সময় জ্বালাপোড়া ও ব্যথা করা।

৩) ঘন ঘন পেশাব হওয়া।

৪) কখোনো কখোনো যৌন মিলনের সময় ব্যথা ও কষ্ট হওয়া।

ট্রাইকোমনিয়াসিস্

মহিলা :

১) যৌনাঙ্গ থেকে পুঁজ বা পুঁজের মতো স্রাব যাওয়া/ যোনিপথে সাদা স্রাব যাওয়া।

২) যৌনাঙ্গে চুলকানি হওয়া।

৩) পেশাব করার সময় জ্বালাপোড়া ও ব্যথা করা।

৪) কখোনো কখোনো যৌন মিলনের সময় ব্যথা ও কষ্ট হওয়া।

সিফিলিস

মহিলা ও পুরুষ :

১) যৌনাঙ্গে বা এর আশপাশে ঘা।

২) কুঁচকির ও শরীরে অন্যান্য গ্রন্থি (গ্লান্ড) ফুলে যাওয়া।

ক্যানডিডিয়াসিস

১) যৌনাঙ্গে চুলকানি।

২) যৌনাঙ্গ থেকে পুঁজ বা পুঁজের মতো স্রাব যাওয়া।

৩) যোনিপথে সাদা স্রাব যাওয়া।

হারপিস্ জেনিটালিয়া

মহিলা ও পুরুষ :

১) যৌনাঙ্গে ফোস্কা বা ফুসকুরি পড়া।

২) মহিলাদের যোনিপথে পানির মত স্রাব যাওয়া।

৩) পেশাব করার সময় জ্বালাপোড়া ও ব্যথা করা।

শ্যাংক্রয়েড

১) কুঁচকির ও শরীরে অন্যান্য গ্রন্থি (গ্লান্ড) ফুলে যাওয়া।

২) যৌনাঙ্গের আশপাশে ঘা।

সঠিক সময়ে এই রোগের চিকিৎসা না করালে পরবর্তীতে যে জটিলতা দেখা দিতে পারে :

১) নারী ও পুরুষ উভয়ের সন্তান জন্ম দেয়ার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে

২) নারী-পুরুষের যৌন ক্ষমতা কমে যেতে পারে

৩) সন্তান নষ্ট হবার ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে।

৪) মৃত সন্তান জন্ম দেবার সম্ভাবনা থাকে

৫) জরায়ুর মুখে ক্যান্সার হতে পারে

৬) আক্রান্ত পুরুষের মূত্রনালী সরু হয়ে যেতে পারে

৭) শিশু অন্ধ হয়ে জন্ম নিতে পারে, ইত্যাদি।

প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনরোগ হলে করণীয়

১) লজ্জা না করে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব মা-বাবা অথবা অভিভাবকের কাছে এই সমস্যার কথা জানাতে হবে ও তাদের কার সাথে নিকটস্থ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র অথবা মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র অথবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স অথবা জেলা সদর হাসপাতাল অথবা চর্ম ও যৌন রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট থেকে পরামর্শ নিবে।

২) বিবাহিত হলে অবশ্যই নিজের এবং সঙ্গীর (স্ত্রীর বা স্বামীর) একসঙ্গে চিকিৎসা করাতে হবে।
৩) চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পূর্ণ মেয়াদে ওষুধ খেতে হবে এবং অন্যান্য বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে।
৪) পরবর্তীতে যেন এ ধরণের রোগ আর না হয় সে ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে।
৫) যৌন মিলনের সময় অবশ্যই কনডম ব্যবহার করতে হবে।

এইচআইভি ও এইডস কি?

এইচআইভি একটি ভাইরাস, এই ভাইরাস থেকে এইডস হয়। এইচআইভি মানুষের শরীরে ঢোকার পর ধীরে ধীরে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়, শরীরের এই অবস্থাকে এইডস বলে। এইচআইভি শরীরে প্রবেশ করার পর থেকে এইডস হিসাবে প্রকাশ পেতে বেশ কিছুদিন সময় লাগে। তবে একবার এইচআইভি শরীরে প্রবেশ করলে কোনো না কোনো সময় এইডস দেখা দেবেই। এইডস -এর পরিনতি নিশ্চিত মৃত্যু।

এইচআইভি কিভাবে ছড়ায়

১) যার শরীরে এইচআইভি ভাইরাস রয়েছে এমন কারো সাথে অনিরাপদ যেকোন ধরণের যৌন মিলন হলে।
২) এইচআইভি ভাইরাস রয়েছে এমন ব্যক্তির রক্ত অন্য কারো শরীরে সঞ্চালন করা হলে।
৩) আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত সুচ, সিরিঞ্জ জীবাণুমুক্ত না করে অন্য কারো শরীরে ব্যবহার করলে।
৪) এইচআইভি ও এইডস আক্রান্ত মা থেকে গর্ভবস্থায়।
৫) প্রসবের সময় সন্তানের মাঝে সংক্রমিত হতে পারে।
৬) আক্রান্ত মায়ের বুকের দুধ খাওয়ার মাধ্যমেও সন্তানের মাঝে এর সংক্রমণ হতে পারে।

এইচআইভি কিভাবে ছড়ায় না

এইচআইভি কিভাবে ছড়ায় আর কিভাবে ছড়ায় না এটা নিয়ে অনেকের মাঝে নানা ধরণের ভুল ধারণা এবং কুসংস্কার প্রচলিত আছে। দেখা যায় কোথাও

এইডস রোগী আছে জানলে অন্যদের মধ্যে ভয়-ভীতি কাজ করে। অনেকে মনে করেন রোগীর কাছে গেলেই তিনি এইডস -এ আক্রান্ত হয়ে যাবেন। এ ভুল ধারণার কারণে অনেকেই এইডস রোগীদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করে তার জীবন বিপন্ন করে তোলে। তাই এইচআইভি কিভাবে ছড়ায় সেটা যেমন জানতে হবে, পাশাপাশি কীভাবে ছড়ায়না সেটাও সঠিকভাবে জানা প্রয়োজন। এইচআইভি কিভাবে ছড়ায় সেটা পূর্বের পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে। এখন আমরা জানবো যে, কিভাবে এইডস ছড়ায় না।

১) হাঁচি, কাশি, কফ-থুথু বা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে।
২) একসাথে এক ঘরে বসবাস করলে বা এক বিছানায় ঘুমালে।
৩) একসাথে বা একই থালা-বাসনে খাওয়া-দাওয়া করলে।
৪) একসাথে খেলাধুলা বা একই স্কুলে পড়াশোনা করলে।
৫) মশা বা কোনো পোকা-মাকড়ের কামড়ে।
৬) আক্রান্ত ব্যক্তির কাপড় ব্যবহার করলে।
৭) হাত মেলালে বা কোলাকুলি করলে।
৮) একই বাথরুম ব্যবহার করলে।
৯) একই পুকুরে গোসল করলে এইচআইভি ছড়ায় না।

এইচআইভি-তে আক্রান্ত ব্যক্তির লক্ষণসমূহ

সাধারণ লক্ষণ :

১) এক মাসের বেশি সময় ধরে একটানা কাশি।
২) সারা দেহে চুলকানিজনিত চর্মরোগ।
৩) বার বার সারা দেহে 'হারপিস জস্টার' (বিশেষ ধরণের চর্মরোগ) এর সংক্রমণ।
৪) মুখ ও গলায় ফেনাযুক্ত এক ধরণের ঘা / ছত্রাক ঘা (আঠালো)।
৫) লসিকাগ্রন্থি ফুলে যাওয়া।
৬) স্মরণশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা কমে যাওয়া।
৭) ক্লান্তি ও ক্ষুধাহীনতা দেখা দেয়া।

মারাত্মক লক্ষণ :

১) শরীরের ওজন শতকরা ১০ ভাগের বেশি কমে যাওয়া;
২) এক মাসের বেশি সময় ধরে একটানা বা থেমে থেমে পাতলা পায়খানা হওয়া।
৩) এক মাসের বেশি সময় ধরে একটানা জ্বর অথবা জ্বর জ্বর ভাব থাকা।

এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধে করণীয়

এইডস-এর কোনো চিকিৎসা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। উন্নত বিশ্বের কোনো কোনো ওষুধ এইচআইভি ভাইরাসকে পুরোপুরি কার্যকর হওয়াকে কিছুটা বিলম্বিত করতে পারে। তবে সেটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এইচআইভি থেকে রক্ষা পাবার শ্রেষ্ঠ উপায় হলো প্রতিরোধ করা। যেমন–

১) ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা।
২) স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা।
৩) যৌন মিলনের সময় সঠিকভাবে কনডম ব্যবহার করলেই যৌনরোগসহ এইচআইভি প্রতিরোধ করা সম্ভব।
৪) ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ব্যবহার করা।
৫) রক্ত গ্রহণের আগে অবশ্যই পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া যে তা এইচআইভি মুক্ত।
৬) যৌন রোগের লক্ষণ দেখা গেলেই দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া এবং সে অনুযায়ী পূর্ণ মেয়াদে চিকিৎসা গ্রহণ করা।

কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা যেসব কেন্দ্রে পাওয়া যায় সেগুলো হলো :

১) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র; (UH&FWC)।
২) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স।
৩) জেলা সদর হাসপাতাল।
৪) আজিমপুর মাতৃসদন ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।
৫) মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, ঢাকা।
৬) মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।
৭) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়।
৮) এনজিও ক্লিনিক।
৯) বেসরকারী ক্লিনিক।
১০) প্রাইভেট ডাক্তার চেম্বার।

এই বয়সের ছেলে-মেয়েদের মনের যত প্রশ্ন

প্রশ্ন : ভালো স্বাস্থ্য ধরে রাখতে হলে আমাদের কি কি করণীয়?

উত্তর : কৈশোরকালীন সময়ে শরীর দ্রুত বাড়ে। এ বৃদ্ধি ১০ থেকে ১৯ বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। দেহের বৃদ্ধির জন্য এ সময় প্রচুর আমিষ ও ভিটামিনযুক্ত খাবার খাওয়া প্রয়োজন। ছেলে-মেয়েদের শারীরিক উচ্চতা ও গঠন কেমন হবে তা তাদের এ সময়ের পুষ্টির ওপর নির্ভর করে। দেহের চাহিদা অনুযায়ী এ সময়ে পুষ্টিকর ও সুষম খাবার গ্রহণ করা হলে শরীরের বৃদ্ধি পুরোপুরি হয়। কাজেই, শরীর সুস্থ রাখতে হলে পরিমিত পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার যেমন- ডাল, ছোট মাছ, শাক-সবজি, ফল-মূল, ডিম, দুধ, মাংস, গুড়া ইত্যাদি খেতে হবে। পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের পাশাপাশি সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রচুর পরিমাণে নিরাপদ পানি পান করা এবং সেই সাথে নিয়মিত ব্যায়াম, বিশ্রাম ও খেলাধুলা করা দরকার।

প্রশ্ন : আমার অসুস্থ এবং দুর্বল লাগে কি করবো?

উত্তর : অনেক কারণে তোমাদের দুর্বল লাগতে পারে যেমন-রক্তস্বল্পতা, অপুষ্টি, বিভিন্ন রোগ ইত্যাদি। ভালোভাবে খাওয়াদাওয়া করা, বিশ্রাম নেয়া ও ব্যায়াম করার পরেও অসুস্থ বা দুর্বল লাগলে ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া উচিত।

প্রশ্ন : ব্রন হচ্ছে কি করবো?

উত্তর : তোমাদের কারো কারো মুখে এ সময় ব্রণ বা দানা দেখা দিতে পারে। অধিকাংশ ব্রণ আকারে ছোট হয় এবং এমনিতেই চলে যায়। ব্রণে হাত দেয়া উচিত নয়। কম ঘুম, মানসিক দুশ্চিন্তা, কোষ্ঠকাঠিন্য (শক্ত পায়খানা) এবং অতিরিক্ত চা, কফি ও ধূমপান করার কারণে ব্রণ হতে পারে। মুখ তেলতেলে থাকলে ব্রণ হয়। প্রচুর ফলমূল ও শাকসব্জি খেলে, বেশি করে পানি পান করলে এবং মুখমণ্ডল পরিষ্কার রাখলে ব্রণ কম হয়। অল্প পরিমাণ ভালো সাবান অথবা ভালো ব্র্যান্ডের ফেসওয়াস ক্রিম দিয়ে মাঝে মাঝে মুখ ধুয়ে ভালভাবে মুছে ফেলবে। ব্রণ থেকে বেশি দাগ হয়ে গেলে চর্মরোগের ডাক্তারের পরামর্শ নেবে।

প্রশ্ন : যোনিপথে স্রাব নির্গত হয় কেন? এ ধরনের রোগ হলে আমি কি করব?

উত্তর : একটি মেয়ে যখন ১২-১৩ বছর বয়সে অর্থাৎ বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছে, তখন তাদের যোনিপথ থেকে এক ধরনের স্বচ্ছ, সাদা বা হলদে স্রাব বের হতে শুরু করে। স্রাবের পরিমাণ কোনো মেয়ের কম, আবার কোনো মেয়ের বেশি হতে পারে। যোনিস্রাব বের হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। স্বাভাবিক নিয়মেই স্রাবের পরিমাণ কখনো বাড়ে বা কখনো কমে। স্রাব কখনো শুষ্ক ও আঠালো, আবার কখনো ভেজা ও পাতলা হতে পারে। যেহেতু যোনিপথে স্রাব হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার তাই এর জন্য চিন্তিত হবার বা চিকিৎসা নেবার কোনো দরকার নেই।

তবে যোনিপথে বা জরায়ুতে কোনো সংক্রমণ (ইনফেকশন) হলে প্রচুর পরিমাণে গন্ধযুক্ত সবুজ বা হলুদ স্রাব বের হয়। অনেক সময় এর সাথে চুলকানি ও জ্বালাপোড়া হতে পারে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

প্রশ্ন : আমার বন্ধু অপু এবং আমি একই বয়সের, তারপরও সে দেখতে কেন ছোট? ১৩/১৪ বছরের ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে মেয়েদের কেন বড় দেখা যায়?

উত্তর : ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কেউ অনেক সময় দ্রুত বাড়ে আবার কেউ ধীরে ধীরে বাড়ে। এ বৃদ্ধি কারো কারো ক্ষেত্রে একটু অল্প বয়স হতে শুরু হয় এবং কারো কারো ক্ষেত্রে দেরিতে শুরু হয়। সেজন্য একই বয়সের একটি ছেলেকে একটি মেয়ের তুলনায় অথবা একটি ছেলেকে আরেকটি ছেলের তুলনায় ছোট কিংবা বড় দেখায়।

বয়ঃসন্ধিকালে তোমাদের দেহে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়। তোমরা যখন বড় হও তখন শরীরে হরমোন বা রস তৈরি হয়। তোমাদের দেহের এসব পরিবর্তন হরমোনের কারণে হয়। মনে রেখো ছেলে-মেয়ে উভয়েরই হরমোন আছে, তবে তাদের হরমোন আলাদা এবং এ কারণে তাদের পরিবর্তনও এক রকম নয়।

হরমোনের কারণে এ সময় ছেলেদের মুখে দাড়ি-গোঁফ গজায় এবং দেহে লোম বেশি হয়। অপরদিকে, মেয়েদের স্তন বৃদ্ধি পায়। ছেলে ও মেয়েদের বগলে ও যোনি অঞ্চলে এবং ছেলেদের বুকেও চুল গজায়। ছেলেদের বগল ও যৌনাঙ্গে লোম গজাবার ২/৩ বছর পর দাড়ি ও গোঁফ গজায়। লোম বা দাড়ি-গোঁফ সবার সমান হয় না এবং এর ওপর কারো পুরুষত্ব নির্ভর করে না।

প্রশ্ন : আমার নাম সুমি, তাহলে আমি কি বড় হয়ে গেছি?

উত্তর : যখন একটি মেয়ে ১০-১২ বছর বয়সে পৌঁছে, তখন তার শারীরিক পরিবর্তন শুরু হয়। যেমন-উচ্চতা বাড়ে, মাসিক শুরু হয়, স্তন বড় হয়, বগলে ও যৌনাঙ্গে চুল বা লোম গজায় ইত্যাদি। এই পরিবর্তনগুলিই হচ্ছে একটি মেয়ের বড় হয়ে ওঠার লক্ষণ।

প্রশ্ন : কখনো দেখা যায় অল্পবয়সী মেয়েদের অনেক বড় স্তন। এটা কিভাবে হয়?

উত্তর : এক এক মানুষের শরীরের গঠন তার শারীরিক বৃদ্ধি ও পুষ্টির ওপর নির্ভর করে। এ কারণে মেয়েদের স্তনের আকারয়োট কিংবা বড় হতে পারে। বয়ঃসন্ধিকাল শুরু হওয়ার পর দেহের অন্যান্য পরিবর্তনের সাথে মেয়েদের স্তন বড় হতে থাকে। কোনো কোনো মেয়ের স্তন দ্রুত, আবার কারো কারো ধীরে ধীরে বড় হয়। স্তনের গঠনের এবং আকারেরও পার্থক্য দেখা যায়। শারীরিক বৃদ্ধি, মেদ ও পুষ্টি কম বেশি হওয়ার কারণে মেয়েদের স্তনের আকারয়োট বা বড় হতে পারে। স্তন বড় হওয়ার সময় কিছুটা চুলকানি বা সামান্য ব্যথা অনুভব হতে পারে। স্তন বড় হলে মেয়েরা ব্রা ও ওড়না পরে। স্তন বড় হওয়া মেয়েদের সাবালিকা হওয়ার লক্ষণ। এ সময় তাদের নারীসুলভ চেহারার বিকাশ ঘটে।

প্রশ্ন : কেন ১৩/১৪ বছরের একটি মেয়েকে ওড়না, পায়জামা ও ব্রা পরতে হয়?

উত্তর : এ সময় মেয়েদের স্তন বড় হতে থাকে বলে তারা ব্রা, ওড়না পরে। পর্দা রেখে চলার জন্য ওড়না পরা হয়, তাছাড়া ওড়না পরা আমাদের দেশে সামাজিক প্রথা।

প্রশ্ন : মেয়েদের কেন মাসিক হয়, ছেলেদের কেন হয় না?

উত্তর : মেয়েদের শরীরে জরায়ু থেকে প্রতি মাসে মাসিক হয়। যেহেতু ছেলেদের মেয়েদের মতো জরায়ু নেই তাই তাদের মাসিক হয় না।

প্রশ্ন : মাসিক কেন হয়?

উত্তর : মেয়েরা যখন বড় হয় তখন প্রতি মাসে ডিম্বাশয় থেকে একটি ডিম্বাণু বের হয়ে ডিম্ববাহী নালীতে আসে। একই সময় জরায়ুতে রক্তে ভরা নরম পর্দা তৈরি হয়। যদি এসময় যৌন মিলন হয় তাহলে শুক্রানুর সাথে ডিম্বাণু মিলিত

হয়ে ভ্রূন তৈরি হয়। এই ভ্রূন রক্তে ভরা নরম পর্দায় গিয়ে বসে ও ধীরে ধীরে বড় হয়ে শিশুতে পরিণত হয়।
যদি শুক্রাণুর সাথে ডিম্বাণুর মিলন না হয়, তাহলে এই পর্দার আর প্রয়োজন হয় না। তখন এই রক্তে ভরা পর্দা ডিম্বাণুসহ মাসিক হিসাবে যোনিপথ দিয়ে বেরিয়ে আসে।
কোনো আঘাত বা অসুখের কারণে এই রক্ত পড়ে না। এ বয়সে একটি মেয়ে যে স্বাতাবিকভাবে বেড়ে উঠছে এবং সন্তান ধারণের ক্ষমতা লাভ করেছে, মাসিক তারই প্রমাণ।

প্রশ্ন : যখন আমার প্রথম মাসিক শুরু হলো তখন আমি ভাবলাম এ আমার কি হলো?

উত্তর : মাসিক একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। সাধারণত মেয়েদের ১২-১৩ বছর বয়সে মাসিক শুরু হয়। এজন্য ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তবে প্রথম মাসিকের সময়ে অনেকেই ভয় পায়, কারণ তারা মাসিক শুরু হওয়ার আগে এ ব্যাপারটা জানে না। মেয়েরা যখন বড় হতে শুরু করে তখন মা অথবা অন্যান্য মহিলা যেমন- বড় বোন, ভাবী তাকে আগে থেকে এ ব্যাপারটা যদি বুঝিয়ে বলেন তবে মেয়েটি লজ্জা ও ভয় কাটিয়ে উঠতে পারে।

প্রশ্ন : এই মাসিকের রক্তপড়া কি বন্ধ হবে না? এটা আবার কি ঝামেলা?

উত্তর : অধিকাংশ মহিলা মনে করেন যে, মাসিক একটি ঝামেলার ব্যাপার কিন্তু এটি জীবনের একটি বাস্তব সত্য। এটি একটি মেয়ের স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার এবং সন্তান ধারণের ক্ষমতা লাভের লক্ষণ। এই রক্ত পড়া সাধারণত: ১২-১৩ বছর থেকে শুরু হয় এবং ৪৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সে স্বাভাবিক নিয়মে বন্ধ হয়ে যায়।
মেয়েদের প্রথম মাসিক হলে কোনো কোনো সময় তা অনিয়মিত হয়। কোনো মাসে হয়, আবার কোনো মাসে হয় না। মাসিকের রক্তের পরিমাণও কম-বেশি হতে পারে। অধিকাংশ মেয়ের কয়েক বছরের মধ্যে এই অনিয়মগুলো দূর হয়ে যায়।

প্রশ্ন : মাসিকের সময় কিভাবে চলতে হয়?

উত্তর : মাসিকের সময়ে রক্ত যাতে বাইরে গড়িয়ে না পড়ে সেজন্য পরিষ্কার কাপড়, তুলা অথবা স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার করতে হয়। এগুলি তিন-চার ঘন্টা পর পর বদলাতে হয়। এছাড়া নানা মাপের জাঙ্গিয়া বা প্যান্টি পাওয়া

যায়। কাপড় বা তুলার সাথে এগুলো ব্যবহার করা যায়। একই কাপড় যদি বারবার ব্যবহার করা হয় তবে সেগুলো সাবান দিয়ে ধুয়ে রোদে / বাতাসে শুকাতে হবে। মাসিক চলাকালীন সময়ে নিয়মিত গোসল করতে হবে, পরিষ্কার জামা-কাপড় পরতে হবে, পুষ্টিকর সব ধরনের খাবার খেতে হবে এবং স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে হবে।

প্রশ্ন : কেউ মাসিকের রক্ত দেখে ফেললে তা কি লজ্জার ব্যাপার নয়?

উত্তর : কোনো সময় মাসিকের রক্ত গড়িয়ে বা চুইয়ে পড়তে দেখলে আমরা সবাই শুরুতে চিন্তিত থাকি। এমনকি বসা থেকে উঠে দাঁড়াতেও ভয় পায়, অস্বস্তি বোধ করে। মাসিকের সময় ব্যবহৃত কাপড়, তুলা বা প্যাড কয়েক ঘন্টা পর পর পরিবর্তন করে এবং এগুলো ঠিকভাবে পরা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করে অতি সহজেই রক্ত গড়িয়ে পড়া বন্ধ করা যায়। কাপড় বা তুলা ঠিকভাবে ব্যবহারের সুবিধার জন্য সঠিক মাপের জাঙ্গিয়া বা প্যান্টি ব্যবহার করা যেতে পারে।

মাসিকের রক্ত মেয়েদের জরায়ুতে তৈরি হয় এবং দুষিত নয়। তবে দেহের বাইরে আসার পর এতে সংক্রমণ (ইনফেকশন) ঘটতে পারে। তাই মাসিকের সময় স্যানিটারি প্যাড, কিংবা ভালভাবে ধোয়া সুতি কাপড় ও প্যান্টি ব্যবহার করতে হয়। প্রতিবার প্যাড পরিবর্তনের পর পরিষ্কার পানি দিয়ে যৌনাঙ্গ ধুয়ে ও মুছে নিতে হবে। কাপড় ব্যবহার করলে সাবান দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে কাপড়টি রোদে শুকিয়ে নিতে হবে।

প্রশ্ন : মাসিকের সময় তলপেটে ব্যথা হলে কি করা উচিত?

উত্তর : মাসিকের সময়ে অনেকের কোমরে বা পেটে রাখা অথবা মাথা ব্যথা হতে পারে। বিশ্রাম, হালকা ব্যায়াম ও গরম সেঁক ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। কিন্তু বাথা যদি বেশি হয় তবে অবশ্যই ডাক্তার দেখিয়ে বাথা কমানোর ওষুধ খেতে হবে।

মাসিকের সময় তলপেটে ব্যথা হলে বোতলে/হট ওয়াটার ব্যাগে গরম পানি নিয়ে সেঁক দিলে আরাম পাওয়া যায়। এ সময় স্বাভাবিক দৈনন্দিন কাজকর্ম চালিয়ে যেতে কোনো অসুবিধা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

প্রশ্ন : আমি শুনেছি মাসিকের সময় মাছ খাওয়া উচিত নয়, কারণ এতে রক্তে দুর্গন্ধ হয়। আমি খেয়ে দেখেছি। আসলেই কি মাছ খেলে এমন হয়?

উত্তর : মাসিকের রক্তের গন্ধের সঙ্গে অন্য কোনো রক্তের গন্ধের কোনো পার্থক্য নাই। মাছ খাওয়ায় রক্তের গন্ধের ওপর তার কোনো প্রভাব পড়ে না। রক্তের দুর্গন্ধ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাসিকের কাপড় ৩-৪ ঘণ্টা পর পর বদলে নিতে হবে এবং তোমার দেহ ভালভাবে পরিষ্কার রাখতে হবে। তোমাদের অনেকেরই ভুল ধারণা থাকতে পারে যে, মাসিকের সময় মাছ, মাংস, ডিম খাওয়া যাবে না। এটা ঠিক না। বরং এসময় এসব খাওয়াসহ সব ধরনের পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে।

প্রশ্ন : মেয়েরা ১৩/১৪ বছর বয়সে বড় হয়, ছেলেরাও কি বড় হয়?

উত্তর : সাধারণত ১০-১২ বছর বয়সে একটি ছেলের শারীরিক পরিবর্তন শুরু হয়। যেমন- উচ্চতা বাড়তে থাকে, কাঁধ চওড়া হয় এবং মাংশপেশী শক্ত হতে থাকে। ছেলেরা যে সাবালক হয় তার লক্ষণ হচ্ছে দাড়ি-গোঁফ গজানো। এ সময় গলার স্বরেরও পরিবর্তন হয়।

প্রশ্ন : অনেকের স্বপ্নদোষ হয়। কেন হয়? (স্বপ্নদোষ কেন হয়?)

উত্তর : একটি ছেলে যখন ১২-১৩ বছর বয়সে পৌঁছায় তখন তার বীর্যথলিতে বীর্য তৈরি হতে শুরু করে। বীর্য যখন ঘুমের মধ্যে বেরিয়ে আসে, তখন তাকে স্বপ্নদোষ বলে। একটি ছেলে যে বড় হচ্ছে স্বপ্নদোষ তারই প্রমাণ। এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কোনো কোনো সময় যৌনবিষয়ক চিন্তা বা স্বপ্নের সাথে স্বপ্নদোষের সম্পর্ক থাকে। কারো স্বপ্নদোষ না হওয়াও কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় এবং এর অর্থও এই নয় যে, তার দেহে বীর্য ঠিকমত তৈরি হচ্ছে না।

প্রশ্ন : অনেকে বলে স্বপ্নদোষ হলে শরীরের সব শক্তি বের হয়ে যায়। এটা শরীরের ভিতর ধরে রাখার কোনো উপায় আছে কি?

উত্তর : স্বপ্নদোষের মাধ্যমে শরীরের কোনো শক্তি বের হয় না। স্বপ্নদোষের কারণে শরীর দুর্বলও হয়না। শরীরের ভিতর বীর্য তৈরি হয় এবং স্বাভাবিক নিয়মেই আবার তা শরীর থেকে বের হয়ে যায়। এক্ষেত্রে শরীরের ভিতরে বীর্য ধরে রাখার কোন উপায় নেই। বয়ঃসন্ধিকালে স্বপ্নদোষ একটি স্বাভাবিক ব্যাপার এবং বড় হওয়ার সাথে সাথে স্বপ্নদোষ আস্তে আস্তে কমে আসে।

প্রশ্ন : স্বপ্নদোষ হলে কি করতে হয়?

উত্তর : স্বপ্নদোষ একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এবং এটি কোনো রোগ নয়। তাই এর কোনো চিকিৎসাও নেই। স্বপ্নদোষ শারীরিক কোনো অসুবিধা করে না অথবা শরীরকে দুর্বলও করে না এবং এটি নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

প্রশ্ন : অত্যধিক পরিশ্রম করলে কি স্বপ্নদোষ হয়?

উত্তর : অত্যধিক পরিশ্রমের সাথে স্বপ্নদোষের কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন : শুনেছি ছেলেদের রক্ত থেকে বীর্য তৈরি হয়। কথাটা কি ঠিক? (ছেলেদের রক্ত হতে কি বীর্য তৈরি হয়?)

উত্তর : রক্ত থেকে বীর্য তৈরি হয় না। বীর্য তৈরি হয় ছেলেদের বীর্যথলিতে। ১২-১৩ বছর বয়স থেকে বীর্য তৈরি শুরু হয় এবং এটি সারা জীবন চলতে থাকে। তোমার বীর্য কোনো সময়ই ফুরিয়ে যাবে না। তাই, কারো স্বপ্নদোষ হলে এ নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তবে স্বপ্নদোষ হয়ে কাপড় ভিজে যাওয়ায় অনেক ছেলেই অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে। কিন্তু স্বপ্নদোষ নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। প্রায় সব ছেলেরই এরকম হয়ে থাকে, এবং এটি তোমার বেড়ে ওঠায় কোনো বাধা নয়।

প্রশ্ন : আমার লিঙ্গ খাড়া হয়ে যায় কেনো?

উত্তর : এই বয়সে ছেলেদের লিঙ্গ খাড়া হওয়াও একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। সকালের দিকে এরকম বেশি হতে পারে। সাধারণত দেহমনে যৌন অনুভূতি বা ইচ্ছা জাগলে, যৌনবিষয়ে কোনো কিছু ভাবলে, দেখলে বা পড়লে লিঙ্গ খাড়া হয়। বয়ঃসন্ধিকালে লিঙ্গ খাড়া হওয়ায় তুমি হয়তো অবাক হতে পারো এবং অস্বস্তি বোধ করতে পারো; তবে তোমার মন অন্য দিকে নেয়ার জন্য এ সময় তুমি অন্য কিছু সম্পর্কে চিন্তা করতে পারো।

প্রশ্ন : যখন ছেলে-মেয়ে বড় হওয়া শুরু করে তখন মা-বাবা বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে কিভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করা যায়?

উত্তর : এই সময় যদি নিজের চিন্তা এবং সমস্যাগুলি যদি পরিবারের অন্যদের সাথে ভাগাভাগি করে নেয়া যায় এবং সবার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করা যায় তাহলে বিভিন্ন সমস্যা সহজে সমাধান করা যায়।

প্রশ্ন : বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক পরিবর্তন মোকাবেলায় আমাদের কি করা উচিত?

উত্তর :

১) ধৈর্য ধরতে ও ভালোমন্দ বিচার করতে চেষ্টা করো :

বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তন ঘটার ফলে স্বাভাবিকভাবেই তোমাদের মানসিক পরিবর্তন আসে। এ সময় তোমাদের মনে নানা প্রশ্ন আসে, মন চঞ্চল হয়ে ওঠে, কি করবে তা অনেক সময় বুঝতে পারো না। স্বাভাবিকভাবে তোমাদের শরীর, চেহারা, পোশাক ও আচার-আচরণ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠো। ঘন ঘন মেজাজ পরিবর্তন হয়ে থাকে। এ সময় তোমরা অনেকে নিজেদেরকে বড় ভারতে শুরু করো এবং অন্যের কাছেও আশা করো যে তারা তোমাদের বড় ভাবুক। তোমাদের মনে স্বাধীন ও স্বনির্ভর হওয়ার ভাবনা আসে এবং নিজেদের খেয়াল খুশি মতো চলতে ইচ্ছা করে। এ সময় তোমরা নিজেদের নিয়ে ভাবতে পছন্দ করো।তাই,সকল কাজে ধৈর্য ধরতে ও ভালোমন্দ বিচার করতে চেষ্টা করো।

২) বন্ধুত্বের পাশাপাশি পড়াশুনাও করবে :

এ সময় তোমাদের কারো কারো অনেক বন্ধুবান্ধব থাকে। মেয়েরা ছেলেদের প্রতি এবং ছেলেরা মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করো। এ বয়সে তোমরা চারপাশের অনেক জিনিস যেমন- উপন্যাস, খেলাধুলা, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি অনেক কিছু আবিষ্কার করে থাকো।তাই, এ সময় তোমরা লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে পড়তে পারো এই ভয়ে অনেক বাবা-মা তোমাদের নিয়ে চিন্তিত থাকেন। তবে এই বয়সে ভালো, ভদ্র ও মেধাবি বন্ধু-বান্ধবের সাথে মেলামেশার প্রয়োজন রয়েছে। এই মেলামেশার মাধ্যমেই তোমরা সমাজ জীবনের সাথে পরিচিত হও এবং অন্যদের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক গড়ে তুলতে শেখো। সব সময় মনে রাখতে হবে, বন্ধুবান্ধবের সাথে অতিরিক্ত মেলামেশা করলে পড়াশুনা ও অন্যান্য স্বাভাবিক কাজকর্মের ক্ষতি হতে পারে।

৩) বাবা-মাকে বুঝতে চেষ্টা করো :

বয়ঃসন্ধিকাল তোমাদের বেড়ে ওঠার সময়। এ সময়ে তোমাদের নিজেদের চিন্তা-ভাবনা ও ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে চাও। বাবা-মার আদেশ-উপদেশ প্রায় সময়ই তোমাদের ভালো লাগে না। মনে করো, বাবা-মা তোমাদের চিন্তা-ভাবনা, ইচ্ছা বা অনুভূতি বুঝতে পারেন না। অনেক সময় বাবা-মা তোমাদের সাথে একমত হন না

বলে তোমাদের খারাপ লাগে। তবে মনে রাখতে হবে যে, বাবা-মা তোমাদের সবচেয়ে আপনজন এবং তারা সব সময় তোমাদের কল্যাণ কামনা করেন। তাই তাদের কথা তোমাদের বুঝতে চেষ্টা করতে হবে।

৪) বাবা-মার সাথে সহজ হও, সমস্যা কমে আসবে :

বাবা-মায়েরা বয়স্ক মানুষ এবং জীবন সম্পর্কে তাদের অনেক বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে। তারা ভালভাবেই জানেন যে, সমাজে কেবল ভালো জিনিসই নেই, খারাপ জিনিসও রয়েছে। তোমাদের বেড়ে ওঠার সময় বাবা মায়ের নির্দেশনা খুবই প্রয়োজন। মা-বাবার পরামর্শ ও উপদেশ তোমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে, সঠিক পথে চলতে এবং সুখী-সুন্দর জীবন গড়তে সহায়তা করবে। তাই এ সময়ে যদি নিজেদের সমস্যা নিয়ে বাবা-মায়ের সাথে খোলাখুলি আলাপ করো এবং তাদের পরামর্শ নিয়ে চলো, তাহলে তোমাদের সমস্যা অনেক কমে আসবে।

প্রশ্ন : মা-বাবা কোথাও যেতে নিষেধ করলে খুব রাগ হয়, কেন বুঝতে চায় না তারা?

উত্তর : যখন একটি ছেলে বা মেয়ে ১০-১২ বছরে তখন তাদের শরীরে অনেক পরিবর্তন হয়। এ মেয়েদের মাসিক শুরু হয়, ছেলেদের দাড়ি-গোঁফ গজায়। এরকম আরো অনেক নতুন নতুন বিষয়ের সাথে তাদের পরিচয় হয়। তাছাড়া এ সময়ে মনেরও পরিবর্তন হয় এবং ছেলে-মেয়েরা নিজেদের ইচ্ছা মতো চলতে চায়। ছেলে-মেয়েরা যেন ভুল না করে, সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে পারে সেজন্য বাবা-মা বিভিন্ন উপদেশ দেন এবং শাসন করেন। এ সময়ে সব ব্যাপারে যদি বাবা-মার সাথে খোলামেলা আলাপ করা হয়, তবে সমস্যা সহজেই সমাধান হয়ে যায়।

প্রশ্ন : আগে রাস্তাঘাটে খেলা করতাম, এখন কেন পারি না?

উত্তর : আমাদের দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছেলে এবং মেয়েদের সমান চোখে দেখা হয় না এবং তাদের সাথে একই রকম ব্যবহার করা হয় না। জন্মের পর থেকেই বিভিন্নভাবে তারা এ বৈষম্যের শিকার হয়। বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে ও মেয়েদের সাথে বাবা-মা ও পরিবারের এ আচরণের তারতম্য আরো বেশি করে নজরে আসে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় মেয়েটির অবস্থান ছেলেটির চেয়ে নিচে। যথাযথ সুযোগ পেলে ছেলে এবং মেয়ে উভয়ই সমানভাবে যে-কোনো কাজ করতে পারে।

এসময় নিরাপত্তা ও সম্মানের কারণে বাবা-মা মেয়েদের ব্যাপারে আরো বেশি চিন্তিত থাকেন। স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও বন্ধু/বান্ধবী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ছেলেদের থেকে মেয়েদের ওপর বেশি বিধিনিষেধ চাপিয়ে দেন। এ সময়ে মেয়েরা যাতে কোনো রকম যৌন নিপীড়নের শিকার না হয় সে ব্যাপারে বাবা-মা বিশেষভাবে সতর্ক থাকেন।

তোমরা যারা কিশোর-কিশোরী তারা সকল ব্যাপারে বাবা-মা ভাই-বোন অথবা পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সাথে খোলাখুলি আলোচনা করবে কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের সাথে তোমরা একমত না হলে তা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব। এতে তোমাদের সমস্যা দূর হবে এবং বাবা-মায়ের সাথেও সুসম্পর্ক বজায় থাকবে।

প্রশ্ন : উত্যক্ত করা কি স্বাভাবিক ব্যাপার? এটা কি আসলেই মজা করা?

উত্তর : বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের কিছু দৈহিক পরিবর্তন ঘটে যা তাদেরকে পুরুষদের কাছে আরো আকর্ষণীয় করে তোলে। তোমরা হয়তো জান যে, তোমাদের চেয়ে বয়সে বড় ছেলেরা, এমনকি প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষরা রাস্তাঘাটে মেয়েদের কিংবা মহিলাদের উত্যক্ত করে থাকে। কোনো কোনো সময় মেয়েরাও ছেলেদের উত্যক্ত করে থাকে।

তুমি যদি মেয়ে হও, তুমিও এ ধরনের আচরণ পছন্দ করবে না এবং অস্বস্তি বোধ করবে। কেউ তোমাকে উত্যক্ত করার চেষ্টা করলে তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো সেখান থেকে চলে যাবে এবং উত্যক্তকারীকে উপেক্ষা করবে।

তুমি যদি ছেলে হও, হতে পারে তোমার বন্ধুরাই মেয়েদের উত্যক্ত করছে এবং তোমারও তাদের সাথে যোগ দেয়ার ইচ্ছা হতে পারে এই মনে করে যে, এতে দোষের কিছু নেই, এটা কেবল মজা করা। কিন্তু ভেবে দেখ, যে মেয়ে বা মহিলাকে উত্যক্ত করা হচ্ছিল, সে যদি তোমার বোন হতো। কিংবা তোমার মা, খালা-চাচী কেউ হতেন। তুমি কি পারতে তাকে উত্যক্ত করতে?

প্রশ্ন : কিভাবে আমরা যৌন নিপীড়ন থেকে নিজেকে রক্ষা করব?

উত্তর :

১) আগ বাড়িয়ে কেউ বেশি আপনভাব দেখালে, সাহায্য বা উপকার করতে আসলে ভেবেচিন্তে তা গ্রহণ করবে।

২) কাউকে ভালো লাগলে চট করে তার সাথে ভাব জমিয়ে ফেলবে না।

৩) অচেনা কোনো নারী বা পুরুষের সাথে একা চলাফেরা করবে না।
৪) কারো আচারণ বা কোনো কিছু অস্বস্তিকর মনে হলে তার সামনে কখনো একা যাবে না বা থাকবে না।
৫) সমবয়সী, বয়স্ক, ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বা প্রতিবেশীদের কাছ থেকে বিশেষ করে শারীরিক ঘনিষ্ঠতা থেকে সাবধানে থাকবে।
৬) একা একা চলাফেরা না করে যতদূর সম্ভব দল বেধে চলাফেরা করবে।
৭) কোনো দ্বিধা, প্রশ্ন বা সমস্যা দেখা দিলে মা-বাবার সাথে খোলাখুলি আলোচনা করবে।
৮) কেউ যৌন নিপীড়ন বা ধর্ষণ করলে বা এ অবস্থার মুখোমুখী হলে চুপচাপ না থেকে অভিভাবককে জানাবে।
৯) পরিচিত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে যৌন নিপীড়নকারীর কথা জানিয়ে দেবে যাতে সবাই তার কাছ থেকে সাবধানে থাকে।

প্রশ্ন : আমার এক বান্ধবীর গায়ে তার এক শিক্ষিত আত্মীয় হাত দিয়েছিল। শিক্ষিত হয়েও সে একাজ কেন করলো?

উত্তর : অনেক মেয়েদেরই এ ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়। এ ধরনের আচরণ হচ্ছে এক ধরনের যৌন নিপীড়ন। যে কোনো ধরনের আচরণ, কথা বা শারীরিক ছোঁয়া-তা যার দ্বারাই হোক না কেন, যদি অস্বস্তিকর হয়, তবে তাকে যৌন নিপীড়ন বলা যেতে পারে। এ ধরনের যৌন নিপীড়ন যে কোনো জায়গায় যেমন- রাস্তাঘাটে, বাসে, কর্মক্ষেত্রে এমন কি বাসায় হতে পারে।

অনেক সময় নিকট আপনজনও যৌন নিপীড়ন করতে পারে। ছোট ছেলেরা এবং অল্পবয়সী মেয়েরা যৌন নিপীড়নের শিকার বেশি হয়। যারা যৌন নিপীড়ন করে তারা অনেক সময় নানা ধরনের ভয় দেখায় যাতে এ ব্যাপারটা অন্যরা জানতে না পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কোন দ্বিধা না করে অভিভাবক বা বড় যাদের সাথে সহজে কথা বলা যায়, তাদের জানানো উচিত। এটা কোন মতেই চুপচাপ সহ্য করা উচিত নয়। যৌন নিপীড়ন আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।যৌন নিপীড়ন মানে যৌন নির্যাতন।

প্রশ্ন : যৌন নিপীড়নের মুখোমুখি হলে কি করবো?

উত্তর :

১) তাকে জানিয়ে দাও যে তুমি এসব পছন্দ করো না এবং ব্যাপারটি অন্য কাউকে বলে দেবে।

২) তোমার বড় ভাই-বোন বা বাবা-মাকে এ সম্পর্কে জানাও।
৩) ঐ মানুষটির সাথে আর কখনো একা হবে না।
৪) সে অন্য কাউকে বলে দেবে বলে ভয় দেখালেও তার কথায় বিশ্বাস করবে না।
৫) এ ব্যাপারে নিজেকে কখনো দোষী ভাববে না।

প্রশ্ন : পরিবার পরিকল্পনা কি?

উত্তর : সাধারণ অর্থে পরিবার পরিকল্পনা বলতে আমরা জন্মনিয়ন্ত্রণ বুঝে থাকি। প্রকৃত অর্থে পরিবার পরিকল্পনার সংজ্ঞা অনেক ব্যাপক। একটি পরিবারের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতির লক্ষ্যে একটি দম্পতি ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা সচেতনভাবে চিন্তা ভাবনা করে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাকেই বলা যায় পরিবার পরিকল্পনা অর্থাৎ সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিবারের সার্বিক মঙ্গল উন্নতি সাধন করাই পরিবার পরিকল্পনার লক্ষ্য।

প্রশ্ন : জন্মনিয়ন্ত্রণ কি?

উত্তর : স্বামী স্ত্রী যৌন সংগমের ফলশ্রুতিতেই স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্ম নেয়। স্ত্রী দেহে ডিম্বথলিতে যে হাজার হাজার ডিম থাকে প্রতি মাসে তারই একটি পরিপক্ক হয়ে ডিম্ববাহী নালীতে আসে। সেই সময়ে স্বামীর সংগে সহবাস হলে পুরুষের শুক্রকীট স্ত্রী ডিমের সংগে মিলিত হয়ে প্রাণের সঞ্চার করে। তারপর মিলিত ডিম স্ত্রী জরায়ুতে ধীরে ধীরে বড় হয়ে পূর্ণাংগ শিশুরূপে পরিণত হয়। সন্তান জন্মের বিভিন্ন স্তরগুলো হচ্ছে :
ক) স্ত্রী দেহে পরিপক্ক ডিম থাকতে হবে।
খ) পুরুষের সক্রিয় শুক্রকীট থাকতে হবে।
গ) ডিম ও শুক্রকীট মিলিত হতে হবে।
ঘ) মিলিত ডিম জরায়ুর গায়ে বসতে হবে এবং ২৮০ দিন জরায়ুতে বড় হতে দিতে হবে।

এই ঘটনার কোথাও বাধার সৃষ্টি হলেই জন্ম হবে না। জন্মনিয়ন্ত্রণের বিধি পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে শুক্রকীট ও ডিমের মিলনের মাঝে বাধা সৃষ্টি করাকে জন্মনিয়ন্ত্রণ বলা হয়।

গুড টাচ (ভালো আদর), ব্যাড টাচ (খারাপ আদর) বিষয়ক প্রশ্ন উত্তর

প্রশ্ন : আমাদের বডি পার্টস বা শরীরের অংগগুলো কয় ধরনের?
উত্তর : দুই ধরনের, পাবলিক পার্টস বা যেগুলো জামার বাইরে থাকে, আর প্রাইভেট পার্টস বা যেগুলো জামার ভেতরে ঢাকা থাকে।

প্রশ্ন : প্রাইভেট পার্টস কেন বলে এগুলোকে?
উত্তর : কারণ, এগুলো আমাদের গোপন ও ব্যক্তিগত জায়গা, যা কেউ স্পর্শ করতে পারে না, দেখতে পারবে না বা এসব নিয়ে কোনো খেলাও করা যাবে না।

প্রশ্ন : কোনগুলো তোমার শরীরের প্রাইভেট পার্টস?
উত্তর : ছেলেদের ক্ষেত্রে – পেনিস (penis), স্ক্রোটাম (scrotum), নিতম্ব (buttock), thigh, নিপল (Nipples), ঠোঁট (lips)
মেয়েদের ক্ষেত্রে – ভালভা (Vulva or vagina), স্তন (breasts), নিতম্ব (buttock), thigh, ঠোঁট (lips)

প্রশ্ন : ভালো আদর (গুড টাচ) কোনগুলো?
উত্তর : যে আদর পাবলিক পার্টস বা খোলা অংশে করা হয়, যেমন কেউ হাতে ধরতে পারে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে পারে।

প্রশ্ন : খারাপ আদর (ব্যাড টাচ) কোনগুলো?
উত্তর : জামার নিচে বা প্রাইভেট পার্টস ও এর আশেপাশের জায়গায় যদি কেউ স্পর্শ করে।

প্রশ্ন : কেউ যদি প্রাইভেট পার্টস এ হাত দেয় বা আদর করতে চায় বা খেলতে চায় এটাকে কি বলে?
উত্তর : যৌন হয়রানি বা যৌন নিপীড়ন বা যৌন নির্যাতন।

প্রশ্ন : কে কে করতে পারে যৌন হয়রানি?
উত্তর : অপরিচিত বা পরিচিত, যেমন দারোয়ান,ড্রাইভার, আংকেল বা শিক্ষক যে কেউ। যেই হোক তা এসে বাবা-মা কে বলতে হবে এবং এ ব্যাপারে কোনো সংকোচ করা যাবে না।

প্রশ্ন : যৌন হয়রানি কোথায় হতে পারে?

উত্তর : যে কোনো জায়গায়, নিজের বাসায়, স্কুলে, যানবাহনে, যেখানেই হোক তা অবশ্যই সম্ভব হলে সাথে সাথে বাবা-মা কে বলতে হবে

প্রশ্ন : এবিউসাররা (দুষ্টু লোকেরা) সাধারণত কি বলে থাকে বাচ্চাদের ভয় দেখানোর জন্য, এগুলো কি সত্য?

উত্তর : তুমি যদি কাউকে বলো তাহলে তোমাকে মেরে ফেলবো/যাকে বলবে তাকে মেরে ফেলবো/ তোমার বাবা- মা তোমাকে বিশ্বাস করবে না, তোমাকে অনেক বকা দিবে, মারবে/তুমি যদি কাউকে বলো তাহলে তুমি মারা যাবে কিন্তু এই কথাগুলো একদম ভুল তাদের কোনো কথা বিশ্বাস করবে না। বাবা মা কে বলে দিবে।

প্রশ্ন : কি হবে যদি দুষ্টু লোকেরা তোমাকে খারাপ আদর করে বা যৌন হয়রানি (সেক্সুয়ালি এবিউস) করে আর তুমি কাউকে না বলো?

উত্তর : দুষ্টু লোক তোমার সাথে এই কাজ বার বার করতে থাকবে, আর তোমাকে হুমকি দিতেই থাকবে। তুমি ভয় পাবে, তোমার পড়ায় মনোযোগ দিতে পারবে না, খেলায় মনোযোগ দিতে পারবে না, তোমার কিছু ভালো লাগবে না। তুমি পড়াশোনায় খারাপ করবে।

তোমাদের জন্য কিছু পরামর্শ

আমার অনেক প্রিয় লেখক লেখিকার মধ্যে একজন প্রিয় লেখিকার নাম আনোয়ারা সৈয়দ হক। তিনি অনেক বড় একজন মনো চিকিৎসক। আমি যখন তোমাদের মত ছোট, স্কুলে নবম শ্রেণীতে পড়ি তখন তার যৌন শিক্ষা বিষয়ক লেখা আমাকে অনেক হেল্প করেছে। আবার আমি যখন বড় হয়েছি, ডাক্তার হয়েছি, তখনও তার অনেক লেখা আমার ডাক্তারি অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছে। তার বলা খুব দরকারি কিছু পরামর্শ আমি তোমাকে দিচ্ছি। সেগুলো হলো :

তুমি দিন দিন বড় হচ্ছো, তোমার শরীরের সৌন্দর্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, শরীরের সাথে সাথে বিকশিত হচ্ছে তোমার মন; লেখাপড়া, বন্ধুবান্ধব, হৈ-চৈ, হাসি-গান-আনন্দে ভরপুর হয়ে কেটে যাচ্ছে তোমার দিনগুলো। নিজের শরীর সম্পর্কে তুমি একেবারে বেখেয়াল, একেবারে নির্মল ও সরল।

কিন্তু তুমি জানো না তোমার আড়ালে, তোমার বাবা-মায়ের বাজপাখি দৃষ্টি এড়িয়ে কিছু দুর্বৃত্ত তোমাকে খেয়াল করে দেখছে। এসব দুর্বৃত্ত তোমার চেনাশোনার পরিমণ্ডলের ভেতরেই ঘোরাফেরা করছে। একটা নতুন গাছে সদ্য ফুটে ওঠা ফুলের কুঁড়িটি দেখলে, অনেক বদমায়েশ মানুষ আছে, যারা চট করে কুঁড়িটি ছিড়ে ফেলে দু'আঙ্গুলের ভেতরে চটকে নিয়ে একটু গন্ধ শুঁকেই মাটিতে ফেলে দেয়। এসব দুর্বৃত্ত হচ্ছে তাদের দলের।

এরা জন্মগতভাবেই মানসিকভাবে বিকৃত হয়ে থাকে। এদের দৃষ্টি কেবল কচি ছেলেমেয়েদের চারপাশ ঘিরে ছোঁক ছোঁক করে। এদের তুমি বাইরে থেকে চিনতেও পারবে না, কারণ বাইরে থেকে এদের চেহারা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এদের ভেতরেই একজন হয়তো হঠাৎ করে একদিন তোমার শরীরে ছোবল মেরে বসবে, হও তুমি ছেলে বা মেয়ে, মোটা বা শুকনো, কালো বা শাদা। তারা তোমার উঠতি বয়সের কচি শরীরটাই চায়, আর কিছু না।

তাই খুব সাবধান। অচেনা কোনো মানুষের সঙ্গে তো বটেই, অচেনা কোনো আত্মীয়স্বজনকেও কখনো মা-বাবার বা ভাইবোনের অসাক্ষাতে গায়ে হাত দিতে দেবে না। অচেনা কোনো মানুষের সঙ্গে কক্ষনো বাইরে বেড়াতে যাবে না যতোই তোমার মনে চিড়িয়াখানার বাঘ দেখার সাধ জাগুক না কেন।

অনেক উঠতি বয়সী ছেলেরা আমাকে এসে বলেছে, তারা সমকামী হয়েছে, কারণ ছেলেবেলায় যে দূর সম্পর্কের 'ভাই' বা 'আত্মীয়'র সাথে তারা বিছানায় ঘুমোতো, সে তাকে প্রতি রাতে তার পবিত্র শরীরে সাপের ছোবল মেরেছে।

রাতের অন্ধকারে যখন মা-বাবা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুম দিচ্ছেন, তখন এই দুর্বৃত্ত তাকে যৌন খেলায় প্ররোচিত করেছে, না খেললে তাকে ভয় দেখিয়েছে। তার তখন ভয় লেগেছে, কষ্ট হয়েছে, আতঙ্ক হয়েছে মনে, কিন্তু বকা খাবার ভয়ে বা তাকে 'মেরে ফেলবে' ভয়ে সে কাউকে বলতে পারেনি। ক্রমাগত এরকম হতে হতে সে এই যৌন খেলাটাকেই জীবনের স্বাভাবিক খেলা হিসেবে নিয়েছে বেছে এবং সামাজিকভাবে তার জীবনে নেমে এসেছে বিপর্যয়।

বহু উঠতি বয়সী মেয়েও আমাকে ঐ একই কথা বলেছে, সে সমকামী হয়েছে। কারণ যখন সে একবার দেশে একা একা বেড়াতে গিয়েছিলো বা বাড়িতেই 'বড় আপার সঙ্গে বিছানায় শুয়েছিলো, তখন ....' ইত্যাদি ইত্যাদি। হয়তো সেই বড় আপার জীবনেও উঠতি বয়সে আর এক 'বড় আপা' ছিলো। এগুলো এমন বিকৃত কথা যে পড়তে পড়তে তোমার গা শিউরে উঠবে, কিন্তু জীবনে বড় হবার পথে অজস্র বাধা, এটিও তাদের অন্যতম। তাই তোমাকে জানতে হবে।

মানসিকভাবে যদি মানুষ ছেলেবেলা থেকে নিজেকে সুস্থ করে গড়ে তুলতে না পারে, তাহলে তার পুরো জীবনটাই বৃথা হয়ে যায়। উঠতি বয়সে মেয়েদের স্তন স্পর্শ করা বহু ঝানু পুরুষের শখ, তেমনি উঠতি বয়সে ছেলেদের লিঙ্গ স্পর্শ করা বহু ঝানু পুরুষ ও মেয়েদের শখ, তাই তোমাকে খুব সাবধানতার সঙ্গে চলতে হবে।

উঠতি বয়সে বহু মানুষ তোমার সাথে বন্ধুত্ব করতে চাইবে, কখনো তোমার বন্ধু হিসেবে, কখনো শুভার্থী হিসেবে, তুমি এজন্যে খুশির চোটে লাফিয়ে কাঁপিয়ে উঠবে না। মনে মনে ধীরস্থির হয়ে বিচার-বিবেচনা করবে। যে লোকটি তোমার শুভার্থী হতে চায় বা যে মেয়েটি বা ছেলেটি তোমার বন্ধুত্ব পেতে আগ্রহী, সত্যিই সে তোমার বন্ধু হবার উপযুক্ত কিনা– ভেবে দেখবে। তোমার নিজের মনেও হয়তো অনেকের বন্ধুত্ব পাবার জন্যে আগ্রহ আছে, কিন্তু আগ্রহ থাকলেই চলবে না, লোকটি তোমার বন্ধু হলে কোনো অসুবিধে হবে কিনা ভবিষ্যতে এটাও ভেবে দেখতে হবে।

সবচেয়ে মূল্যবান যে বস্তুটি তুমি সাথে নিয়ে বেরোও, তা হচ্ছে তোমার শরীর, এই শরীরের দিকে কারো না কারো, কখনো না কখনো অনেক মানুষের লোলুপ দৃষ্টি থাকে। তুমি তা টেরও পাবে না। আর টের পেলেও হয়তো এটাকে পাত্তা দেবে না এই ভেবে যে, 'ও আর আমার কি করবে।' কিন্তু 'ও'-ই দেখা গেল

তোমার সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে বসেছে। তাই শরীরের শত্রুকে কখনো অবহেলা করবে না, সতর্ক থাকবে।

তুমি উঠতি বয়সের মেয়ে হলে তো একটা ছেলের চেয়ে একশো গুণ বেশি সতর্ক থাকবে, কারণ তুমি একটা মূল্যবান জরায়ুর অধিকারী। এই জরায়ুর অধিকর্ত্রী তুমি, তোমার ইচ্ছেই এই জরায়ুর ইচ্ছে, তাই তোমার ইচ্ছেটাকে কখনোই নৈতিকতার নিচে নামতে দেবে না।

আমার লেখা পড়ে তুমি হয়তো ভাবছো, তাহলে তো জীবনে কারো সাথে মিশতে পারবো না, কারো সাথে বন্ধুত্ব করতে পারবো না, কাউকে বিশ্বাস করতে পারবো না, তাহলে এই জীবনের আর অর্থ কি হলো? খাঁটি মানুষ খুঁজতে গিয়ে আমার তো তাহলে ঠগ বাছতেই গাঁ উজাড় হয়ে যাবে।

তোমার কথা খুব সত্যি। কিন্তু এর ভেতরেই প্রচুর মানুষ পাবে যাদের যাদের তুমি ভালোবাসতে পারো, বিশ্বাস করতে পারো, যাদের সাথে বন্ধুত্ব গড়তে পারো, তবে তোমার দেখতে হবে সে ভালো মানুষ কিনা।

বহু মানুষ আছে যারা মেয়েদের শরীরের আশপাশে ছোঁক ছোঁক করে। তাদের তুমি করুণা করবে, কিন্তু কখনোই তোমার কাছে আসতে দেবে না। কারণ- লোকটা তোমাকে দেখে তার মনের জিব দিয়ে লালা ঝরাবে এ তুমি অবশ্যই চাও না। শারীরিকভাবে কাউকে অপমান করলে যে কষ্ট, মানসিকভাবে অপমান করলেও ততোখানিই কষ্ট, তাই তোমার কাছ থেকে সাত হাত দূরে রাখবে তাকে।

অনেক মেয়ের ধারণা যে, "আমার সুন্দর শরীরটাকে যদি কোনো পুরুষ প্রশংসাই না করলো তবে এ জীবনের অর্থ আর থাকলো কী?" এ ধারণা সেইসব মেয়ের, যাদের কাছে শরীরই হচ্ছে একমাত্র এ্যাসেট, যাদের জীবনে আর কোনো কিছুর মূল্য নেই। একজন আদর্শবাদী মেয়ের বা শিক্ষিত পরিবারের মেয়ের বা সচেতন মেয়ের কাছে শরীর যদিও খুবই মূল্যবান, তবু শরীরই তার সারা জীবনের এ্যাসেট বা সম্পদ হতে পারে না এবং এই শরীর দিয়েই সে সবকিছু জয়লাভ করতে পারে না কতিপয় শরীর লোলুপ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছাড়া। কিন্তু তাহলে কি তুমি নিজের শরীরের যত্ন নেয়া ছেড়ে দেবে? কক্ষনো না। শরীর সাজাবে তুমি নিজের জন্যে।

শরীর সাজানো মানেই মন সাজানো। এই সাজানো নিজের জন্যে, নিজের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যে।

উঠতি বয়সে তুমি বড়দের যৌন নির্যাতনের শিকার হতে পারো। সুতরাং, এই বয়সে তোমার সাবধানতা বিশেষভাবে দরকার। এরপর তুমি বড় হয়ে গেলে অনেক কিছু বুঝতে শিখবে এবং সহজভাবে নেবে। কিন্তু উঠতি বয়সে মন থাকে কোমল, বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকে ক্ষীণ। এ বয়সে যেকোনো ধরনের যৌন হুমকি বা যৌন নির্যাতন তোমার মনে মানুষের শারীরিক সম্পর্ক নিয়ে অহেতুক ভয়, ভীতি ও আতঙ্কের সৃষ্টি করতে পারে, অনেক মেয়েতো বড় হয়ে জীবনে বিয়েও করতে পারে না স্বামীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক গড়তে হবে বলে, অনেক ছেলে সারাজীবনের জন্যে সমকামী হয়ে যায়। তাই, যেমন সাবধানে চলতে হবে, তেমনি এ কথাটাও মনে রাখা দরকার যে, জীবনে চলার পথে যদি কোনো এ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়, হতেও পারে, কারণ সবার সামাজিক পরিবেশ এক নয়, তখন কিন্তু একেবারে হাঁটু ভেঙে হতাশ হয়ে বসে পড়লে চলবে না। এর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

কেউ তোমাকে যৌন হয়রানি করলো বা প্রেমের অভিনয় করে তোমাকে ঠকালো, হোক সে ছেলে বা মেয়ে, তাকে তুমি সমস্ত ছেলে জাতির বা মেয়ে জাতির প্রতিনিধি হিসেবে ধরে তোমার সমস্ত জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি সেভাবে গড়ে তুললে, এটা একেবারে গ্রহণযোগ্য নয়। মনে রাখতে হবে, মানুষের জীবন এইসব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনার চেয়ে অনেক অনেক বড়। তাই জীবনকে সম্মান করা শিখতে হবে।